সুকান্তের সমাজচেতনা

নিখিল পাল

মৌসুমী প্রকাশন
১১/৯/১, পর্ণশ্রী পল্লী
কলিকাতা—৬০

প্রথম প্রকাশ :

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রকাশক :

সুরেশচন্দ্র পাল

১১।৯।১, পর্ণশ্রী পল্লী

কলিকাতা—৬০

প্রচ্ছদ :

চিত্তরঞ্জন দত্ত

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শৈবাল আর্ট প্রেস

কলিকাতা—১২

পরিবেশক :

মডার্ণ বুক ডিপো

৩১, বনমালী নস্কর রোড

কলিকাতা—৬০

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব

এবং

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

পূর্ণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের অন্যান্য বই

* বাংলা নাটকে শেক্স্‌পীয়ারের প্রভাব
  (যন্ত্রস্থ)
* সাময়িক পত্রে সেকালের সমাজ-চিন্তা
  (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

ভূমিকা

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে সমাজচেতনার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় রেখে গেছেন তা চিরকাল বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করবে। চল্লিশের দশকের স্বাধীনতার মুখো-মুখি এসে ভারতবর্ষ এক দারুণ রাজনৈতিক সংকটে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শ্রমিক ও কৃষক সমাজের অবর্ণনীয় দারিদ্র, মালিক-জোতদার-মজুতদারদের যোগ-সাজস, বিদেশী শাসকদের সঙ্গে তাদের চমৎকার বন্ধুত্ব, দেশের মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা, মহাযুদ্ধ ও সুযোগ-সন্ধানীর আধিপত্য সুকান্তকে সমাজবাদী বাস্তবতার দিকে টেনেছিল। বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতার যে ছদ্মবেশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়েছিল, বাঙলা কাব্যে সেই ছদ্মবেশ, সুকান্তেরও চোখে ধরা পড়েছিল। এবং সুখের বিষয়, দুজনেই এক বলিষ্ঠ—সমাজবাদী স্বপ্নকে সামনে রেখে সেই ছদ্মবেশের মুখোস খুলে ছিলেন। তাই মানিক ও সুকান্ত উভয়ই স্বক্ষেত্রে এমন এক বলিষ্ঠ ভাষাকে খুঁজে পেয়েছিলেন রক্তের সঙ্গে যে ভাষার বন্ধুত্ব গভীর। সেইজন্যই শুধু চিন্তাগত কারণে সুকান্ত দীর্ঘ-জীবী হবেন না। বাস্তবের গভীরে যে আবেগ থাকে সেই আবেগকে বলিষ্ঠ স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দীর্ঘজীবী হবেন। যৌবনের উচ্ছ্বাস সাধারণত টেঁকে না। কিন্তু গভীর অন্তর্জ্বালা যদি সেই উচ্ছ্বাসকে টেনে আনে তবে শিল্পগত শৈথিল্য থাকলেও সে উচ্ছ্বাসকে জীবনীয় মনে হয়। সুকান্তের কাব্যে সেই জীবনীয় প্রাণরস আছে। আছে তার আর ও প্রমাণ; এই মুহূর্তে বসেও তাঁর কবিতা বড় কঠিন সত্য উচ্চারণ

বলে মনে হয়, আর আত্মধিক্কার আসে এই ভেবে যে, কী-প্রচণ্ড মূর্খতার সঙ্গে আমরা এই সাতাশ বছর বাদেও শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে জুয়ো খেলছি।

শ্রী নিখিল পাল যে এই দুর্দিনের মুহূর্তে সুকান্তের কাব্যের সমাজচেতনাকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাতে যে কোন সতর্ক পাঠক খুশি হবেন। তাঁর বিশ্লেষণ শুধু কবির সমাজচেতনাকে পাঠকের কাছে তীক্ষ্ণতর করেনি, সাম্প্রতিককালও যে সুকান্তের মতো দু'দশজন কবির অপেক্ষায় আছে এই আশাও জাগিয়াছে।

তার পরিশ্রমী কাব্য বিশ্লেষণ সামাজিক তাৎপর্যকে চিহ্নিত করেছে বলেই তার এই প্রথম পরিক্রম-চেষ্টা সার্থক হবে আশা রাখি।

উজ্জ্বল মজুমদার

বাঙালা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কথা-মুখ

'সুকান্তের সমাজচেতনা' কবি সুকান্তের জীবন-দর্শন ও জীবন-নাট্যের রূপালেখ্য। সুকান্তের রচনার মধ্যেই সুকান্তকে প্রত্যক্ষ করা চলে। সুকান্তকে বুঝতে বা জানতে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁর পরিচয়, তাঁরই সাধনার পত্র-মঞ্চে স্বাক্ষরিত। অথচ অনেকের দৃষ্টিতেই সুকান্ত যেন ধরা পড়তে চান না,—সে তাঁদের অক্ষমতা, অনেকক্ষেত্রে চারিত্রিক দুর্বলতাও বটে। এত অল্প সময়ে, এত অল্পকথার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র এবং তার মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব-গুলিকে যেভাবে অতি সহজে তুলে ধরতে পেরেছেন এত অল্প বয়সে অন্য কোন কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কবির এই প্রতিভা এবং মননশক্তির বলিষ্ঠ দৃঢ়তা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর স্বচ্ছতা অনেকের মনে ঈর্ষা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যবিত্ত-সুলভ মানসিকতায় সমাজে একাংশের কাছে কবির প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বীকৃতি না মিললেও সমাজের সর্বহারা শ্রেণীর মানস-পটে তাঁর স্থান ও মূল্যমান যে চির উজ্জ্বল থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের একাংশের কাছে কবি সুকান্ত যথার্থ স্বীকৃতি না পেলেও সমাজের প্রগতিবাদী ও সমাজ-বিপ্লবের প্রতি অনুরাগী বুদ্ধিজীবি সমাজের কাছে সুকান্তের স্থান কোন দিনই ম্লান হতে পারে না। সমাজ বিপ্লবের পথে শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি সমাজের যে সক্রিয় ভূমিকা

থাকে, সুকান্ত সে দায়িত্ব পালনে আমরণ তপস্যা করছেন। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের একাংশের প্রবল অনীহা-হেতু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরবারে সুকান্তের আসন কোন দিনই ছিল না—তাছাড়া থাকবার ও কথা নয়। সুকান্তের জীবনে তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

সুকান্ত ছিলেন সর্বহারাশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁর কাব্য-সাধনা সর্বহারাদের জীবন-সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ দিয়েছে। তাই তাঁর কাব্যে কোথাও ছলনা বা আড়াল-আবডাল নেই,—সত্যকে স্পষ্ট করে বলার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন। তাতে অনেকেই মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাঁর কোন আক্রমণ ছিল না। শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই কবির কাছে ধরা পড়েছে।

সমাজচেতনার বিকাশলাভের ক্ষেত্রে তাই তাঁর কাব্যের বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য রয়েছে। এ সত্য যারা স্বীকার করেন না তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। যারা সুকান্তের কাব্যের এই সত্য মূল্যকে সম্পূর্ণ ভাবে পুরোপুরি উপলব্ধি করার প্রয়াসী এবং যাঁরা তাঁর সাধনার সত্যবস্তুকে অন্তরে গ্রহণ করার আগ্রহী তাঁদের হাতেই 'সুকান্তের সমাজচেতনা' গ্রন্থটি উপহার দিলাম। এবং তার বিচারের ভার সুকান্ত পাঠকের উপরই সবিনয়ে অর্পণ করলাম।

'সুকান্তের সমাজচেতা' গ্রন্থে, সুকান্তের শৈশব-মানস, সমকালীন সমাজচিন্তা এবং সুকান্তকাব্যে সমাজচেতনা এই মূল তিনটি অধ্যায় সুকান্তের শৈশব, সমকাল ও সুকান্ত কাব্যে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে এবং সুকান্তের মননচিন্তার উন্মেষ, বিকাশ ও প্রকাশ সম্পর্কে আলোক-পাত করার চেষ্টা করেছি।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর উজ্জ্বল মজুমদার মহাশয়ের অধীনে আমি যে 'বাঙলা নাটকে শেক্সপিয়ারের প্রভাব' বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছি তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণায় আমি এই গ্রন্থ রচনায় ও ব্রতী হয়েছি। তিনি তাঁর অমূল্য সময় বাঁচিয়ে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে যে মনোজ্ঞ ভূমিকাটি লিখেছেন তাতে আমি তাঁর আশীর্বাদই

লাভ করেছি তাঁর প্রতি আমার কেবল আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েই এই ঋণ শোধ হবে না।

সর্বশেষে একটি স্বীকারোক্তি না করে পারি না যে আমার এই নিরব সাধনায় যাঁর নিবিড় প্রেরণা নিয়তই অনুভব করেছি, তাঁর কাছে চিরঋণীই রয়ে গেলাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও সে ঋণ কোন দিনই শেষ হবে না।

তাছাড়া শৈবাল আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও কর্মচারীবৃন্দের যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তাতে তাঁরা আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

উপসংহারে 'সুকান্তের সমাজচেতনার' পাঠককে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই কথা মুখ শেষ করছি।

নিখিল পাল

শৈশব মানস

সৃষ্টির আদিম অঙ্গিকার—তার প্রকাশ প্রিয়তা এবং সত্য শিব ও সুন্দরের মুক্তি ও স্বাধীনতা। জীবন এই সৃষ্টি রহস্যের চিরন্তন সূতিকাগার—চির রহস্যের আধার। সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ এই জীবন ও সৃষ্টি রহস্যের মূলানুসন্ধানেই নিত্য ব্যস্ত। বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শন ও সাহিত্য চিন্তা এই সত্য-সন্ধানের নিত্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের জীবন-দৃষ্টি ও সমাজ-চেতনা যে আদর্শ অনুসরণ করে চলে তার চিন্তাপ্রসূত সৃষ্টি সত্যের বিকাশ ও সে পথের অনুসারী হতে বাধ্য। স্রষ্টার সত্য নিষ্ঠাই সত্যদ্রষ্টারূপে সৃষ্টি সত্যের মূল রহস্য উদ্ধারে সক্ষম। কিন্তু জীবন-দৃষ্টি ও জীবানুভূতির বিভিন্নতার ফলে প্রকাশ ভঙ্গি ও দৃষ্টি কোণের তারতম্য ও বিভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। তাই একই যুগের প্রকাশভঙ্গিতে সৃষ্টি সত্যের রূপরেখা ভিন্নতররূপে ধরা পড়ে। স্রষ্টার এই স্বাতন্ত্র্য বোধ সৃষ্টিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কবি সুকান্ত সেই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েই জন্ম নিলেন ১৩৩৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। বর্তমান আলোচনা কবি সুকান্তের শৈশব জীবনের সেই স্বাতন্ত্র্যও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন প্রভাতের সীমিত রূপরেখা।

সুকান্তের শৈশব জীবন-পরিক্রমায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ বিদ্যমান। যদিও প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, কবি সুকান্তের জীবন সীমাই বা কতটুকু ছিল,—মূলতঃ জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা ও শেষ হতে পারে নি সুকান্তের জীবনে। তবু ও বলা চলে, সুকান্তের এই সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল খুবই সম্ভাবনাময়। তাঁর জীবন ছিল প্রতীক ধর্মী। শৈশবজীবনে গণ্ডিতে আবদ্ধ বাঁধাধরা জীবন সুকান্তের জীবনস্বভাবের পরিপন্থী ছিল। স্বভাব কবির

শৈশব প্রকৃতিতে নতুন পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতা বর্তমান ছিল। তাইতো নতুনের প্রতি আকর্ষণে, তাছাড়া বাঁধাধরা জীবনের প্রতি শৈশব প্রকৃতির অনীহা হেতু কবিকে বাড়ী থেকে একবার পালাতেও দেখা যায়। সর্বদাই একটা স্বাধীন মুক্ত মন, জীবনে মুক্তি অনুভবের চরম প্রয়াসী ছিল। এখানে একটি কথা স্মরণ না করে সুকান্তের এই মানসিকতার উপযুক্ত কারণ অনুসন্ধানকরা উচিত হবে না।

সুকান্ত শৈশব থেকেই স্নেহের বাঞ্ছিত অধিকার লাভের সহজ সুযোগ পান নি। রাণীদি ও মার অকাল মৃত্যুতে কবি সুকান্তের শৈশব মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাছাডা রাণী'দির অকাল মৃত্যুতে তাঁদের যৌথ পরিবারের ভাঙন দেখা দেয়—অথচ জন্ম থেকে কবি যৌথ পরিবারব্যবস্থার মধ্যেই মানুষ হয়ে ছিলেন। এই যৌথ পরিবার জীবনবোধ থেকেই শিশু সুকান্তের জীবনে ও মননে এক সমষ্টি চেতনাবোধ গড়ে ওঠে। রাণীদি কেবল সুকান্তের শৈশব জীবনের সাথীই ছিলেন না—রাণীদি ছিলেন কবি সুকান্তের শৈশব মানসে কাব্যিক চেতনার মূল প্রেরণা-শক্তি। তাই কবির শৈশব চেতনায় রাণীদি র স্মৃতি ছিল যেন 'পরীর মতন'। তারপর মার অকাল মৃত্যুতে কবির জীবনে এক রূপান্তর আসে। স্নেহ-কাঙাল সুকান্ত একাধারে রাণীদি ও মার স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন আরোহীর মত প্রকৃতির উদার স্নেহ ও ভালবাসার প্রতিই গভীরভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। শৈশবে কবির প্রকৃতি-প্রেম স্নেহ-লাঞ্ছিত ও স্নেহ বঞ্চিত মনের গভীর আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ফসল। কবির শৈশব জীবনে প্রকৃতি ছিল উদার-মুক্ত-সত্য-সুন্দররূপে। উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রান্তর কবি মনের নিবিড় বিশ্রাম স্থান ছিল। তাই প্রকৃতি ছিল তাঁর সহজ চেনা ও জানা, পরিচিত পরিজনের মত আপন,—বন্ধুত্বও ছিল নিবিড় —এবং প্রীতির আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল।

সুকান্ত ছিলেন স্বভাব কবি। সুকান্তের শৈশব মনটি ছিল যেমনই মুক্ত তেমনি তার ভাবটিও ছিল অন্তর্মুখী। প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর শৈশব জীবন-বোধে এক অখণ্ড সত্যরূপে ধরা পড়ে। তাঁর জীবন ভাবনায় প্রকৃতি ও মানুষের সত্যস্বরূপই একে অপরের পরিপূরকরূপে চিহ্নিত হতে থাকে। তাই কবির কাছে প্রকৃতি ও মানুষের ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব বড় হয়ে দেখা দেয় না।

নবীন কিশলয়ের মত কবির শৈশব মনটি ও ছিল অতি কোমল। তাতে সহজেই সব কিছু দাগ কাটত। প্রকৃতির রাজ্যের তুচ্ছতম বস্তু ও তাঁর স্বভাব

সুলভ কমনীয়তায় আদরণীয় ছিল। এই প্রসঙ্গে, কবি রবীন্দ্রনাথের শৈশব স্মৃতির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রকৃতি-প্রীতির সহজ অনুভূতিই কবির জীবন-সাধনায় মানুষের জীবনের প্রতি দরদ ও ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি তাঁর প্রবল সহানুভূতির চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সুকান্তের শৈশব জীবনে একদিকে প্রকৃতিপ্রেম এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং তাদের জীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগই ছিল মূলতঃ প্রধান এবং শৈশবের মনন-চেতনার বিকাশতীর্থ। তাই একদিকে প্রকৃতিপ্রীতি ও অপর দিকে মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং প্রীতিবোধই কিশোর সুকান্তকে এই জগৎ ও জীবন এবং বিশ্বপ্রকৃতির সত্যস্বরূপের উজ্জ্বল উদ্ধারে সাহায্য করেছে। কিন্তু স্বভাব-লাজুক সুকান্তের জীবন-প্রকৃতিতে শিশু সুলভ চপলতা বড় একটা ছিল না ;—তাই দেখা যায় বড় এক অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় ও সংবেদনশীল মন ও প্রাণ সব সময় তাঁর দৃষ্টির আকাশ জুড়ে বর্তমান ছিল যার ফলে সেই ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে সর্বশ্রেণীর মানুষের দুঃখ-বেদনা ও জীবন-যন্ত্রণার সত্য প্রকাশ তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টির অন্তরালে কোন তুচ্ছতম বস্তুর স্থান ছিল না। তাঁর দৃষ্টিপথে যে চিত্র সহজেই ধরা দিত—মনের দীপ্তিতে তাই-ই আলোকিত হ'ত এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে তা-ই প্রতিবিম্বিত হ'ত। কবির শৈশবকাল হতেই তাঁর দেশ-মাটি-মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এক গভীর অনুভূতি ও পরম বিস্ময় মনের নিবিড় চত্বরে স্থায়ী আসন পেতেছিল। তাই তো কবি কণ্ঠে শুনতে পাই :

> "আজন্ম দেখেছি আমি আশ্চর্য নতুন এক চোখে
> আমার সোনার দেশ, আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।
> আমার সমুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত মাটি
> ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া-মাটি।"

মণিপুর : ঘুমনেই।

সুকান্ত শৈশবকাল থেকেই ছিলেন বাস্তববাদী। বাস্তবের রূঢ় সত্যই তাঁর জীবন সত্যের মর্মপ্রাচীরে যে শ্রুতিলিপি লিখে গেছে, তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের বাণীলিপিতে। সত্যের কোথাও বিকৃতি নেই,--স্বীকৃতি জানাতেই সে ব্যস্ত। কবি শৈশবকাল হতেই জীবন ও কর্মে সেই সত্যেরই উপাসক ছিলেন, যে সত্য জীবনকে সুন্দর ও প্রকৃতিকে মুক্ত করে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যের উপাসককেই অন্তরে খুঁজেছিলেন যার সাধনায়

জীবন ও প্রকৃতির মুক্ত স্বরূপ ধরা পড়বে। তাছাড়া চির-লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানব-আত্মার মর্মলিপি ও মুক্তিমন্ত্র উচ্চারিত হবে,—দুঃখে ও দারিদ্রে এবং পীড়নে ও অত্যাচারে শ্বাস-রুদ্ধ নির্বাক জনতার মূক ভাষা রূপ লাভ করবে সত্যসন্ধানী নির্ভীক কবির জবানীতে। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির আকাঙ্ক্ষিত মনের কথা সহজ কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন :

"কৃষাণের জীবনে শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয় ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরী।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।"

ঐকতান : রবীন্দ্রনাথ।

কবির এই আকাঙ্খিত সুর মরমী সুকান্তের বাণী বাঙ্ময়ে অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। এই অখ্যাত জনের 'মর্মের বেদনা' প্রকাশে কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতার এই গ্লানির আংশিক ক্ষতিপূরণে কবি সুকান্ত আপন সৃষ্টি-শক্তিকে সার্থক করে তুলেছিলেন। তাই কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' মূক ভাষার সত্য প্রকাশই কবি সুকান্তের কবিতায় ব্যক্ত। কবির শৈশবই ছিল সেই চেতনালাভের উপযুক্ত পরিসর। কেননা পরিচিত সমাজে মানুষের জীবনে দুঃখ-বেদনা, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, মৃত্যু-হাহাকার এসব নানা ঘটনা সুকান্তের শৈশব-জীবনে এক একটি পর্ব-সন্ধি গড়ে তোলে। পরবর্তী জীবনে দৃঢ় মানসিকতার ভিত্তিগঠনে শৈশবের এ ঘটনাগুলো সুকান্তের জীবনে কম উল্লেখ্য নয়। মানুষের বস্তিজীবনের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনে কষ্ট, পীড়ন ও যন্ত্রণা শৈশবেই কবি হৃদয়ে গভীরভাবে

উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া শৈশবে দিদি ও মা-হারা কিশোর সুকান্তের মাতৃ-স্নেহের বিচ্ছেদযন্ত্রণা যে কি গভীর, তা তিনি নিজের জীবন-অভিজ্ঞতায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই অসহায় জীবনে সান্ত্বনা পেতে কবি-হৃদয় এত উৎসুক। কবি কণ্ঠে সকরুণ প্রার্থনা শুনি :

"হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

প্রার্থী : ছাড়পত্র।

মাতৃস্নেহের উষ্ণ-আলিঙ্গনের সুতৃপ্ত সুধাবঞ্চিত অসহায় কিশোরের সকরুণ আকুতি সার্বজনীন সত্যে রূপলাভ করেছে। রাস্তায়-ফুটপাতে, বস্তির কুঁড়ে ঘরে, কত অসহায় মাতৃ-হারা শিশুসন্তানের অসহায় চিৎকার কবির হৃদয়ে হাহাকার তোলে। তাছাড়া সমাজের নানা বৈষম্য কবির শৈশব চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়ে। এই বৈষম্যের জন্য অলৌকিক কোন শক্তির যে হাত নেই কিংবা ঈশ্বরের বিধান ব'লে কোন বাস্তব স্বীকৃতি নেই, এই সত্য সন্ধানে কিশোর সুকান্ত তাঁর শৈশব চেতনার উজ্জ্বল আলোতেই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন আর তাঁর শৈশব প্রতীতেই ধরা পড়েছিল সমাজে এই বৈষম্যের মূলে এই সমাজ—ব্যবস্থাই মূলতঃ দায়ী।

পৃথিবীর জল আলো-মাটি এই তিনের অস্তিত্বে বৈষম্য কোথায়! তবুও মানুষ এই পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় তার ব্যবহারিক জীবনে এই প্রকৃতি-রাজ্যের সাম্যের মধ্যে ও বৈষম্য সৃষ্টি করে বেড়ান। এই বৈষম্য প্রকৃতির নিয়মের অধীন নয়, মানুষের নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। এই প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদের বিষম ভোগের প্রথা যে মানুষের সমাজ-জীবনে শ্রেণী বৈষম্যের সংকেত দান করে তাতে সন্দেহ কোথায়! কিশোর সুকান্ত জীবনে ও মননে সেই সত্যেরই নীরব অন্বেষ্টা। আর সেই অন্বেষাজাত সত্যানুভূতির তথ্য-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ের বিভিন্ন সাধনার ক্ষেত্রে। সমাজ-জীবনে এই শ্রেণী বৈষম্য ও তার অসম বণ্টন ব্যবস্থার সকরুণ চিত্র কবির ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

"বলতে পার বড়ো মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?

বড়ো মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলাম-কুচি, একি অনাসৃষ্টি ?
বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরী যারা করছে,
কুঁড়ে ঘরেই তারা কেন মাছির মত মরছে ?
... ...
বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?"

পুরণো ধাঁধা : মিঠেকড়া।

ধনের ও বিষয় ভোগের এই অসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রকৃতির কোন হাত নেই। মানুষ তার শক্তি ও স্বার্থবুদ্ধির বলে এই প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদকে গ্রাস করেছে। কবি বাস্তবে এই সত্যকে জেনেছেন জীবন অভিজ্ঞতার সত্য মূল্য দিয়ে। তাই তো কবির সক্রোধ ঘোষণায় হৃদয় অনুভূতির মর্ম-লিপি ধরা পড়ে,—যে জীবন-দৃষ্টি কবির শৈশব চেতনায় বাস্তব জীবানুভূতি গড়ে তুলেছিল :

"শোনরে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হ'ল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব দিবি কি তার ?"

বোধন : ছাড়পত্র।

এ তো সমাজের কাছে কেবল কৈফিয়ৎ নয়,—এ যে কবির শৈশব জীবন-বোধের বাস্তব অভিজ্ঞান-লিপি। কবি যে সত্যকে শৈশব কাল থেকেই প্রত্যক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করেছেন শৈশবোত্তর জীবনের পরিণতিতে সেই বাস্তবতারই স্থির, চিত্র আঁকলেন একে একে, আর শোষণ ও বঞ্চনার প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্র আঁকলেন এক একটি বাণী-লিপির মাধ্যমে। তাই কবির শৈশবাবস্থাতেই ভাবনা যত গভীর ছিল তার প্রকাশ ক্ষমতা তত তীক্ষ্ণ ছিল না। কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রবণতা প্রবল ছিল। যদিও প্রকৃতি প্রেম ও মানুষের দুঃখ-বেদনার সুগভীর অনুভূতিই ছিল কবি সুকান্তের শৈশব দিককার বিভিন্ন রচনার মূল উপজীব্য বিষয় তবুও একথা সত্য যে, এই জগৎ-সংসার ও তার চারিদিককার আবেষ্টন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সমাজ-জীবনে যে দারুণ অস্থিরতা, তার ক্ষীণ প্রভাব হলেও কবির শৈশব মনে তার প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়তে শুরু করে। ফলে কবিমনে শৈশব থেকেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে

থাকে এক নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে। প্রাক্‌-যুদ্ধকালীন পৃথিবীর বুকে এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার প্রতি কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল বলেই অতি শৈশবেই কিশোর সুকান্তের মনে প্রশ্ন জেগেছিল :

> "এতো দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
> আজ চেয়ে দেখি শুধু নরক।
> এতো আঘাত কি সইবে,
> যদি না বাঁচি দৈবে?" সুতরাং : পূর্বভাস

কেননা যুদ্ধ সম্পর্কে কবির শৈশব ধারণাই ছিল অতি স্পষ্ট। এই যুদ্ধ যে কেবল পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকেই ঠেলে দেয় না—উপরন্তু পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টির বিনাশ ও সাধন করে তাছাড়া মানবজীবনের সমুখে মৃত্যুর দূতরূপে এসে হাজির হয় এ সত্যকে কিশোর কবি সুকান্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বুঝি—শৈশব জীবনেই কবির মনে প্রশ্ন জাগে,—মানব-জীবনে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কিসে,—কোন পথে? কেননা শৈশব চিন্তায় সহজ অনুভূতিতে কবির চোখে ধরা পড়ে :

> "দ্বারে মৃত্যু,
> বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
> পিছনে কি পথ নেই আর?
> আমাদের এই পলায়ন—
> জেনেছে মরণ,
> অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে,
> প্রস্থানের চেষ্টা হল মিছে।" দুরাশার মৃত্যু : ছাড়পত্র

সুবা ৮৭ চরম মানব বিরোধী এক মহা অভিশাপ,—মানব-সমাজের নশ্বরতাই যে কেবল ঘোষণা করে বেড়ায় সেই চেতনা কবির শৈশব জীবন বোধেই মুক্তি পেতে থাকে। এ সমস্ত ঘটনা-পরম্পরায় কবির শৈশব জীবনের ব্যক্তিচিন্তা পরবর্তী জীবনে বিশ্বজনীন চেতনায় রূপলাভ করতে থাকে। যুদ্ধে বিনাশের পরিণামই যে মানুষের জীবনে শেষ লক্ষ্য নয়,—সেই বিনাশ-যজ্ঞে নতুনের সৃষ্টিই যে মূল লক্ষ্য—সে সত্য কবির শৈশবোত্তর জীবনে প্রকটরূপে ধরা পড়ে। তাই তাঁর শৈশবের এই পরিণত চিন্তার সঙ্গে ভাষা-ভঙ্গির পরিণতরূপ সহজে মনকে আকৃষ্ট করে :

পৃথিবী বিকৃত-রাত্রে অভিশপ্ত প্রসব ব্যথায়
রুদ্ধ শ্বাসে পানরত মেদসিক্ত সুরা।
আবার নতুন সৃষ্টি জন্ম নেবে সভ্যতার
অন্তিম ঔরসে—
নিত্য স্রোতে তাই শুধু কৃষ্ণ পক্ষে
পাণ্ডুর পাণ্ডব;
রক্তস্রাবে আরক্তিম অস্তগামী দিন। অপ্রকাশিত কবিতা।

শৈশব চিন্তায় মানুষ অল্প-বিস্তর রোমান্স প্রবণতার বশ্যতা মেনে চলে। কেননা শৈশবে বাস্তবের রূঢ় সত্যের সঙ্গে সাধারণতঃ পরিচয়ের আগ্রহ থাকে কম। যৌবনে জীবনধর্মের দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়েই মানুষ বাস্তবের কঠিন সত্য উচ্চারণ করে। সুকান্ত যৌবনে সেই কঠিন সত্যেরমর্ম-উচ্চারণ করলেও শৈশবে রোমান্স-প্রবণতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই শৈশবে কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটেছে কবির জীবনে। প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন কিশোর সুকান্ত তাঁর কল্পনেত্রে। তাই কবির এক ভ্রমণের স্মৃতিতে—ধরা পড়ে:

"সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, ধারোয়ার বুকে তারই কালোছায়া। নিমন্ত্রিতের নিঃশব্দে প্রতিটি নক্ষত্র জড়ো হল আকাশের আসরে। কোন্ এক অদৃশ্য কোণ থেকে বকেরা উড়ে এল, মিলিয়ে গেল পিছনে, কিছুক্ষণ আকাশকে আলোড়িত ক'রে। তৃতীয়ার তন্বী চাঁদের আলো নদীর ধারে বালিতে লুটিয়ে প'ড়ে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রতিটি বালুকণাকে। সেই চাঁদের আলো নিজের দেহে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকে বসে গল্প করছে; তাদের কথালাপে, উন্মুক্ত হাসিতে ধারোয়ার তীর মৃদু-গুঞ্জরণে মুখরিত। কিন্তু নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে। কারো হঠাৎ গাওয়া গানের কলিতে চমকে ওঠে সেখানকার সমাধি-গম্ভীর নিসর্গ। দূর থেকে ভেসে আসা তরুণীর কলহাস্যে সাড়া দেয় না এই তপস্যা-মগ্ন পারিপার্শ্ব।" কবি-সুকান্ত: অশোক ভট্টাচার্য।

তাঁর এই স্বাধীন মুক্ত প্রকৃতিপ্রেম কবি রবীন্দ্রনাথের শৈশব-জীবনের নিসর্গপ্রীতি ও কল্পনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের তৈরী ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যে কখনো থাকতে চাইতেন না কবি। তাছাড়া পরিবারের অন্য পাঁচজন

সদস্যের মত পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই কিশোর সুকান্ত বাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর একটা আলাদা জগৎ ছিল,—যে জগতের স্বপ্ন কল্পনার আশ্রয়ে বাস্তব জগতের রূপান্তর সাধনের উপাসনা কবির অন্তর-পটে স্থির উজ্জ্বল ছিল। তাই তাঁর পরিচিত পরিবেশ ও বাস্তব জগতের বর্তমান ছকে বাঁধা পড়ার বিশেষ কোন আগ্রহই ছিল না। তবে একথা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, কবির কল্পনা কেবলমাত্র নিছক বিলাসমাত্র ছিলনা, কবির কল্পনা সত্য-সুন্দরের রূপ-সাধনায় মগ্ন ছিল। এমন কি ক্লাসে বসে,—পড়ার ফাঁকে কিশোর সুকান্তকে দেখা যায় আপন কল্প-জগতের নেশায় তন্ময়, নয়তো বা অন্য কোন মহৎ ভাবনায় বিভোর ও আত্মনিমগ্ন হতে। স্বাধীন কল্পপ্রিয় এই কিশোর সুকান্ত, বাড়ীর অভিভাবক বিশেষ করে বাবার সুনজরে ছিলেন না। তাঁরা যেভাবে সুকান্তকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সে পথে সুকান্তের মন ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা ভাল যে সুকান্তের জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ছিলেন তৎকালীন বাঙালী সমাজে একজন শক্তিশালী সংস্কৃত পণ্ডিত। তিনি কলকাতা ও ঢাকা থেকে উপাধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের রেনেসাঁর প্রভাব বর্তমান ছিল। পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ও সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল তাছাড়া মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। তাই সুকান্তের পিতৃ-মাতৃকুলে ক্লাশিক সাহিত্যের এক নিবিড় চর্চা ছিল। বিশেষ করে সুকান্তের জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বাড়ীতে এক সংস্কৃত সাহিত্য সভায় অনুরাগী পণ্ডিতগণ নিয়মিত উপস্থিত হতেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে যে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ধ্যানে তখন কল্লোল যুগের ঝড়ের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। তাই সেই হাওয়ার রেশ সুকান্তদের বাড়ির সীমানায় বৈঠকখানার চত্বরে ও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। কাকা সরোজ ভট্টাচার্য ও জ্যাঠতুত দাদা রাখাল ভট্টাচার্য বাড়ীতে প্রাচীন-পন্থী সাহিত্য চক্রের পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্য আলোচনার এক নতুন চক্র খুলে বসলেন। সাহিত্য চক্রের আলোচনায় বিষয়-বস্তু ছিলেন বিশেষ করে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশ সেন, ও 'রমলা' প্রণেতা মণীন্দ্রনাথ বসু। প্রাচীন ও নব্য-পন্থীর এই সাহিত্য সঙ্গম—পরিবেশেই শিশু সুকান্ত শৈশব সুকান্তের মান-সিকতায় বিকাশ লাভ করতে থাকেন। নানা রূপকথার আঙ্গিনায় শৈশব

মনটি ঘোরা-ফেরা করলেও বাস্তবের ধূলি-মাটি ও তার বুকে মানুষের জীবন ভাবনায় কিশোর সুকান্তের অন্তর স্পর্শ নিয়তই বর্তমান ছিল। তাই কিশোর সুকান্তের জীবন ভাবনা আপন কল্পিত পথে শেষ পর্যন্ত পা বাড়ালো—যে পথ মসৃণ নয়—যে পথে পদে পদে বাধা-বিপদ এবং পথযাত্রা ভয়ঙ্কর। এই ভাবে কিশোর সুকান্ত শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন-মৃত্যুর ছায়াপাতে বাড়ীর অভিভাবকদের অনেকেরই হিসাবের ভুল প্রমাণ করে দিলেন। যদিও সুকান্ত সব সময়েই অঙ্ক শাস্ত্রে খুব কাঁচা ছিলেন। তবে একথা সত্য যে মানুষের জীবন প্রবাহের গতিধারাকে সব সময় গাণিতিক নিয়মে বিচার করা চলে না, সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সুকান্তের জীবন সুবিশাল নয়। জীবনের শুরুতেই সমাপ্তির যবনিকা সংকেত নেমে আসে কবির জীবনে। অথচ যৌবই জীবনধর্ম পালনের প্রারম্ভিক কাল-পর্ব। তাই সাধারণ মানুষের জীবন যেখানে শুরু, সুকান্তের জীবন সেখানেই সারা হোলো। সুকান্তের জীবন নাট্যের এখানেই ট্র্যাজেডি। তাই যেখানে শুরুতেই শেষ সেখানে আলোচনার পরিসরই বা কতটুকু! তবুও যতটুকু তাঁর জীবন নাট্যের স্বীকৃতি মেলে তার মূল্য ও জাতির জীবনে কম নয়,—তাছাড়া এত অল্প কথা ও অল্প বলার মধ্যে এত গভীর জীবন জিজ্ঞাসা ও মর্মানুভূতি এবং তার উজ্জ্বল প্রকাশ জাতির জীবনে কম বিস্ময়ের নয়! এত সহজ, সরল বাচন-ভঙ্গি, এত গভীর মর্ম উপলব্ধি কজন কবির মধ্যে মেলে! অথচ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বাচন-ভঙ্গিতে রয়েছে সমাজ ও সভ্যতার নিগূঢ় সত্যের মর্মচেতনার রূপ-বানী।

যৌবনে পা দিতে না দিতেই ঝরা বসন্তের বিদায়ের সুর বেজে ওঠে সুকান্তের জীবনে। মাত্র একুশ বছরের এই জীবন-নাট্যে কবির বেশিরভাগ সময়ই কাটে নানা রোগে। তার মধ্যে কিশোর জীবনের অধ্যায়টি কবি সুকান্তের জীবনে, ভাব ও কল্পনার জগতে মুক্তপক্ষ বিস্তারের অনুগামী ছিল। তাই কবি সুকান্তের শৈশব জীবন-বানীর উল্লেখ্য বিশেষ কোন স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা না থাকলেও কবির কিশোর ও শৈশবকাল ছিল অতি অনুভবের, এবং তা বড়ই মর্মস্পর্শী। শৈশব জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অভাব তিনি অনুভব করেছেন সে সমস্ত ভাবনাই কবির নিবিড় মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। স্নেহ-প্রেম ভালবাসার এই সুকুমার প্রবৃত্তির বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে কবি তাঁর অন্তর সুষমায় উপলব্ধি করেছেন, নিজের জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অনুভব করেছেন,

আর এই ব্যক্তি—অনুভবের মধ্যদিয়ে সার্বজনীন অনুভূতি কবির জীবন চর্চায় ধরা পড়েছে। তাছাড়া মাতৃহারা অসহায় কিশোর সুকান্তের জীবনকে জানার চেয়েও অনুভবের অনুভূতিতেই মুক্তি মেলে। যে মুক্তি সত্যের অনুভূতিতে প্রকাশ পায়।

মানুষের জীবনে শৈশব কালটাই সাধারণতঃ ভাবালুতার কাল বলে চিহ্নিত। সুকান্তের শৈশবে ও সেই ভাবালুতার চিহ্ন বর্তমান। এই অতিরিক্ত ভাবালুতার পিছনে কবির নিঃসঙ্গ জীবনই দায়ী। কেননা একদিকে যেমন নিজের বাড়ীর নিয়ম পরিবেশ বর্তমান ছিল অপরদিকে স্নেহ-মায়া বিবর্জিত কেন্দ্র বিমুখতা কবির শৈশব অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে রাখত। তাই প্রকৃতির রাজ্যের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে শৈশবে কবির জীবন ও মনকে এত নিকট সম্পর্ক ছিল। শৈশবে প্রকৃতির সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা ও স্নেহ-বন্ধনের নিবিড়তা কবির এক চিঠির ভাষায় ধরা পড়ে।

> "……তুই বোধহয় এখবর পাস নি যে, তোদের আগের সেই লতা -চ্ছাদিত, তৃণ শ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর কত উজ্জল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়—হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায় নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাতত নিষপ্রয়োজনতায়। তোর মা এতে পেয়েছেন গভীরতম বেদনা, তাঁর ঠিক আপন জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠল। হয়ে উঠল প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত শত জন-কোলাহল মথিত ইস্কুল বাড়িটি আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্য বিধবা নারীর মত তার অবস্থা। তোদের অজস্র স্মৃতি-চিহ্নিত তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ; সেখানে এখনও বাতাসে বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির সৌরভ।"

এই পরিপূর্ণ আবেগ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শিশু সুকান্ত শৈশবে,—কিশোর সুকান্ত তাঁর যৌবনে পা বাড়ালেন। প্রতিটি পর্ব-সন্ধিতেই সেই আবেগ-ভাবনার রূপ রূপান্তরের চিহ্ন বর্তমান। কবির জীবন যে কত গতিশীল. তারই সাক্ষ্য মেলে কবির চিন্তার জগতের এই রূপান্তর গ্রহণের মধ্যে। কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে তাঁর শৈশব জীবনের এই ভাবালুতা অলীক কোন

কল্পনার আশ্রয় নেয়নি,—বাস্তবতার অস্তিত্ব কল্পনায়ই কবির ভাবনা বিরাজ করেছিল। পরবর্তীকালে শৈশবোত্তর অবস্থায় কর্মী সুকান্তের জীবনে সেই ভাবালুতার স্পর্শ যে ছিল না সে কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। শোষণ মুক্ত সমাজেই মানুষের জীবনে পূর্ণ মুক্তি যে সম্ভব সেই চিন্তার আশ্রয়ই কবি রাত-দিন অবিরাম অবিশ্রাম পরিশ্রম করে গেছেন বিনা দ্বিধায়। তৎকালীন কবির সমসাময়িক সমাজ-জীবনে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে বাস্তব বাঁধাগুলি বর্তমান ছিল, সে সম্পর্কে কবি সচেতন থাকলে ও হৃদয়-আবেগের গভীর উচ্ছ্বাসে সময় সময় তাঁর চিন্তায় সেই ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে। শৈশবের সেই ভাবালুতাই কর্মী সুকান্ত ও কবি সুকান্তকে কর্মেও কাব্যে প্রেরণা যোগিয়েছে। সেই প্রেরণাতেই ব্যক্তি সুকান্ত কর্মী সুকান্তে—কর্মী সুকান্ত কবি সুকান্তে এক অখণ্ড সত্তা নিয়ে সমাজের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তার এই গভীরতা কবির জীবনে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; শৈশবেই কবির জীবন চেতনা কত যে স্বচ্ছ ও জীবানুভূতি কত যে গভীর ও মর্মস্পর্শী তাঁর পরিচয় মেলে কবির দশ-এগার বছরের জীবন-চিন্তার মধ্যে। তাঁর সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব সঙ্গী-সাথীরা যখন খেলা-ধুলা, গল্প-গুজব, নিছক আড্ডাতে মেতে থাকে তখন সেই কিশোর সুকান্ত তাঁর বিচ্ছেদ বিধুর নিঃসঙ্গ জীবনে মুক্তির সন্ধান করে চলেন খাতার পাতায় পাতায়। ভাষার আড়ালে মনের ভাবকে বাঁধতে চেয়েছিলেন কবি আর হৃদয়ানুভূতির মুক্তি খুঁজেছিলেন ভাবের রূপ চিত্রাঙ্কনের মধ্যে। তাঁর শৈশব জীবনের রচনা 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্রে সুকান্তের নিঃসঙ্গ জীবনে নিবিড় মন্ত্রণা ও তাঁর মনন জিজ্ঞাসার এক সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শ মেলে।

"সূর্য যখন লাল টুকটুকে হয়ে দেখা দেয় ভোর বেলায়, রাখাল ছেলে তখন গোরু নিয়ে যায় মাঠে। আর সাঁঝের বেলায় যখন সূর্যডুবে যায় বনের পিছনে, তখন তারে দেখা যায় ফেরার পথে। একই পথে তার নিত্য যাওয়া—আসা। বনের পথ দিয়ে সে যায়—সে যায় নদীর ধারে সবুজ মাঠে—গোরুগুলি সেখানেই চরে বেড়ায়। আর সে বসে থাকে গাছের ছায়ায় বাঁশিটি হাতে নিয়ে। চুপ করে চেয়ে থাকে নদীর দিকে, আপন মনে ঢেউ গুণতে কখন যেন বাঁশিটি কে তুলে নিয়ে তাতে ফুঁদেয়। আর সেই সুর শুনে নদীর ঢেউ নাচতে থাকে, গাছের পাতা দুলতে থাকে আর পাখিরা কিচির মিচির

করে তাদের আনন্দ জানায়।"　　—রাখাল ছেলে : হরতাল।

অতি সহজ সরল অনুভূতির মাঝেও প্রকৃতি ও মানুষের রাজ্যের এক অচিন্তনীয় রূপলাবণ্যের স্পর্শ মেলে। প্রকৃতি প্রেমিক কিশোর সুকান্তের রূপ সচেতন মনের ইঙ্গিত মেলে। এই রূপক রচনায় 'রাখাল' ও কবি চরিত্র এক অভিন্ন আধারে অঙ্কিত হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে হিংসা-দ্বেষ ও লোভের স্থান নেই—তাই তো প্রকৃতির রাজ্য মানুষের এত প্রিয়। এ তো প্রকৃতি রাজ্যের কথা। কিন্তু মানুষের রাজত্বের সব কথা জানা হয়ত তখনও কিশোর সুকান্তের জীবনে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই হিংসা—দ্বেষ-লোভ-পাপ ইত্যাদি জন্ম নেয়, গ্রাস করে এক অপরকে, হিংসার বলিরূপে জীবন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে একে অপরের কারণে। কবি সুকান্তের শৈশব চিন্তায় বাস্তবের এই রূঢ় সত্যের মুক্ত প্রকাশ হয়ত বা তখন ও সম্পূর্ণ হতে পারেনি,—বাস্তবে জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞ-তা লাভের অপেক্ষায় সুকান্তের শৈশব মনটি উন্মুখ ছিল; তাই বনহরিণী তার জীবন দিয়ে সে সত্য মুক্তির পূর্বাভাস জানিয়ে গেল যে, এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে বুঝি সব সময় বিশ্বাস করা চলে না। রাখাল ছেলেকে তাই বন-হরিণী বলল :

> "তোমার বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের আমি
> বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই তুমি বোধ হয় মানুষ
> বলেই আমার মৃত্যুর কারণ হলে।"　—রাখাল ছেলে : হরতাল।

কবি এই রূপক রচনায়, এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের প্রতি মানুষের এই হিংস্রতা ও বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিবাদ কি তোলেন নি?

স্মরণ করা ভালো যে, কবির বয়স যখন প্রায় চোদ্দ বছর, তখনই কবির জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব এসে পড়ে,—মনের চত্বরে বিভীষিকায় ঘূর্ণিপাক চলতে থাকে। মহাযুদ্ধের আঘাত-সংকুল মৃত্যু-তাড়িত পরিবেশ কবির শৈশব মনকে গভীর বেদনায় ভরিয়ে তুলে। যদিও ভারতের বুকে সেই মহাযুদ্ধের হিংস্র তাণ্ডব তখনও আরম্ভ হয়নি-তবুও কবি শুনেছেন, হিটলারের ঝঞ্চা বাহিনী তথা নাৎসী সেনার আক্রমণের কাহিনী,—তাদের বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধ পরিকল্পনা—এক কথায় বিশ্বের মানবতা যেন এই মহাযুদ্ধের মুখোমুখী এক কঠিন পরীক্ষায় আসীন। এ কথা সবার-ই মনে আছে যে, উনিশশ' উনচল্লিশের এপ্রিল মাসে হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণের মধ্যদিয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবির্ভাব সম্ভাবনা ঘটেছিল। আর

এই মহাযুদ্ধের সর্বনাশা রূপ চিন্তা করেই পরিণত শৈশবে সুকান্তের কল্পনাপ্রবণ মনে আধুনিক বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল :

"দূর পূর্বাকাশে
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ
বিস্ফারিত হিংস্র বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত
উত্তপ্ত মাটিতে ঝড়ে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত"

১৯—৮—৪০

পূর্বাভাস : পূর্বাভাস।

পরিণত কিশোর সুকান্তের এই মানসিক যন্ত্রনা ও অস্থিরতা মাঝে মাঝে তাঁর মনে যেমন সংশয়ের দোলা লাগিয়েছে তেমনি সময় সময় হতাশাকেও প্রশ্রয় দিয়েছে :

"ভয়ার্ত শোনিত চক্ষে নামে কালো ছায়া
রক্তাক্ত ঝটিকা আনে মূর্ত-শিহরণ
দিক প্রান্তে শোকাতুরা হাসে ক্রুর হাসি ;
রোগগ্রস্ত সন্তানের অদ্ভুত মরণ।" ২৪—৯—৪০

নিবৃত্তির পূর্বে : পূর্বাভাস।

তবু কবি পৃথিবীর এই আসন্ন সংকট মুহূর্তে মুমূর্ষু পৃথিবীর সাথে ব্যথা-দীর্ণ অন্তরে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করেন :

কেঁদেছিল পৃথিবীর বুক :
গোপনে নির্জনে
ধাবমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের কাছে
পেয়েছিল অতীত বারতা ?
মেরুদণ্ড জীর্ণ—তবু বিকৃত ব্যথায়
বার বার আর্তনাদ করে
আহত বিক্ষত দেহ মুমূর্ষু চঞ্চল,
তবুও বিরাম কোথা ব্যস্ত আঘাতের।" ২৮—৯—৪০

জীবনের প্রতি দরদ ও ভালবাসা এবং তার বিচ্ছেদে গভীর জ্বালাও মনো-বেদনার অনুভূতি কবির জীবন বিশ্লেষণায় আজন্ম স্বীকৃত সত্য রূপে ধরা পড়ে। জীবনকে তিনি অনুভব করেছেন প্রকৃতির মত নির্মল ও সত্য-সুন্দরের প্রতীক-রূপে,—তাই জীবনের বিনাশ আশঙ্কা ও বিচ্ছেদ সম্ভাবনা তাঁর হৃদয়ের গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। বিশ্ব সংকটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সময় সময় কবির জীবনে নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করলেও জীবনের প্রতি যে কবির গভীর আকর্ষণ ছিল সে সত্যকে ভুলে থাকা যায় না।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহজাত জীবনবোধই সুকান্তকে শৈশব জীবনের প্রত্যূষ-কাল থেকে মানবতার প্রতি আস্থাশীল করে তুলেছিল। প্রথম জীবনে কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের খুবই ভক্তছিলেন। তারই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ বলা চলে রবীন্দ্রনাথের ওপর কবির একটি গীতিনাট্য সহ চারটি কবিতা রচনা। তাছাড়া একদিকে রবীন্দ্রনাথের এই যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণা অপরদিকে নোগুচির প্রতি তাঁর আবেদন সুকান্তের সংশয়াকুল মনকে সাড়া জাগিয়েছিল, ইতিমধ্যে সুকান্ত সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও জীবানন্দ দাস, দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি আধুনিক কবিদের কবিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকেন। তাছাড়া এদের কবিতায় সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-চিন্তার মূল দ্বন্দ্বগুলি ও তাদের জীবনের গ্লানি, দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি যে প্রবল আক্রমণ চলছিল এবং তাঁদের কাব্যচিন্তায় জীবনের এক নতুন মূল্য বোধের স্বীকৃতিদানের গভীর অন্বেষা বর্তমান ছিল সে সম্পর্কেও সুকান্তের গভীর দৃষ্টি ছিল। বিশেষ করে পদাতিকে-র কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়র কবিতায় সুকান্ত তাঁর মনের চিন্তার খোরাক অনুভব করেছিলেন—হয়ত বা সেই অনুভব সত্তার বিকাশেই পদাতিকের কবির জগৎ ও জীবন এবং সমাজচিন্তার বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে যুক্ত করার আগ্রহে আরও বেশি হৃদয়ে কাব্যিক প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

শৈশব চিন্তা সাধারণতঃ ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেয়। জীবন অভিজ্ঞতা ও দূর-দর্শিতার প্রচ্ছন্ন ভাবনা, জীবন লক্ষ্যে অনমনীয় দৃঢ়তা ও আস্থা অর্জনে অনেকক্ষেত্রেই বাধা সৃষ্টি করে। এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শঙ্কাকুল ও সংশয়াচ্ছন্ন সমসাময়িক অন্যান্য মনীষীদের মত কিশোর সুকান্তের মন গভীর সংশয়ে ক্লান্ত হলেও বিশ্বজনীন মানবতার প্রশ্নে কবির হৃদয়ে ধীরে ধীরে আস্থা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দৃষ্টি কিশোর সুকান্তের মনে গভীর ভাবে দাগ

কেটে ছিল বলেই প্রথম দিকে শৈশব চিন্তার প্রবল হতাশার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আশার নিশানা পেয়েছিলেন। শৈশবোত্তর জীবন ভাবনায় সেই হতাশদীর্ণ মনের পাতায় আশার বানী লক্ষ্য করি। কবির জীবন ভাবনায় তাই মানবিক সুরের মূর্ছনা জেগে ওঠে। তাই কবির পরিণত শৈশব চিন্তায় আজ পারা না পারার প্রশ্ন বড় কথা নয়,—জীবন চেতনার অলস তন্দ্রা থেকে জাগবার দিন

"জাগবার দিন আজ দুর্দিন চুপি চুপি আসছে;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া-ছবি ভাসছে—
তাদেরই যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশি জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।
আজকের দিন নয় কাব্যের--
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের;

জাগবার দিন আজ : পূর্বাভাস।

তাই এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়েই কবি সম্ভাব্যতার বাস্তব ভিত্তিভূমি গড়ে তুলতে সমাজ-জীবনে মানবিক কর্তব্যের প্রতি কঠিন সত্য উচ্চারণ করেছেন :

"পণ কর দৈত্যের অঙ্গে
হানবো বজ্রাঘাত মিলবো সবাই একসঙ্গে;
সংগ্রাম সুরু মুক্তির
দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।
আজকে শপথ কর সকলে
বাঁচাবো আমার দেশ যাবেনা- তা শক্রর দখলে,
তাই আজ ফেলে দিয়ে শিল্পীর তুলি আর লেখনী
একতাবদ্ধ হও এখনি।" —জাগবার দিন আজ : পূর্বাভাস

সুকান্তের শৈশব চেতনার এই প্রত্যয় বোধই পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির পূর্ণ মুক্তির স্বপ্নে ও ভাবনায় আরও প্রবল ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

ভাব-তন্ময় কিশোর সুকান্ত শৈশবে সময় সময় কল্পলোকের অভিযাত্রী হয়েও পৃথিবীর সীমাকে কখনো অস্বীকার করেন নি। তাই মানুষ ও প্রকৃতির রাজ্যের বাস্তবতার অন্তরালে যে রহস্য বর্তমান, তারই প্রত্যক্ষতার সন্ধান লেছিল কিশোর সুকান্তের জীবন যাত্রার নীরব মন্ত্রণায়। কখনো কখনো

এই বাস্তব পৃথিবীর রূপ কল্পনার সাথে কল্পজগতের রূপ চেতনার অপূর্ব মিল লক্ষ্য করা যায় :

"রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।"

কবি সুকান্ত : অশোক ভট্টাচার্য

বাস্তব ও কল্প জগতের ভাবসম্মিলন ঘটেছে এখানে।

একদিকে প্রকৃতিপ্রেম এবং তার প্রতি কবির গভীরভাব তন্ময়তা, অপরদিকে সমাজ ও মানুষের জীবনের দুঃখ বেদনা, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিবিড় অনুভূতি কবি সুকান্তের শৈশব মানসের ফসল আরাধনা ছিল। শৈশবে কবি প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ পরবর্তীকালে তাদের বন্ধন মুক্তির স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের প্রতি শৈশবেই সুকান্তের গভীর প্রেম ও সহজ হৃদয়ানুভূতি পরবর্তী জীবন সাধনায় প্রকট রূপে ধরা পড়ে। শৈশবে সমাজের বুকে মানুষের জীবনে নৈতিক ও চারিত্রিক যে সমস্ত ত্রুটি ও বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন, রাষ্ট্র ও ধর্মজীবনে পরস্পর মত ভেদ ও অনৈক্য লক্ষ্য করেছেন,—অর্থনৈতিক জীবনে জাতির ইতিহাসে শোষন ও বঞ্চনার নিত্য পীড়ন উপলব্ধি করেছেন,—সেই শৈশব মানসিকতাই পরবর্তী জীবনে, যৌবনে উত্তরণ করেই কবি বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায়,—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়জীবনে জাতির মর্মমূলে যে দৈন্যতার আশ্রয় ঘটেছে সেই দৈন্যতার মুক্তি না ঘটানো পর্যন্ত জাতির জীবনে মুক্তি আসা সম্ভব নয় এ সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির শৈশব চিন্তায় জাতির জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ও এই দৈন্যতার কারণগুলি তত স্পষ্ট ছিল না এবং জাতির জীবনে এই সমূহ সংকটের মুক্তি প্রশ্নে কিংবা সমাধানের সূত্র সম্পর্কেও সঠিক চেতনার বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেনি। কবি প্রত্যক্ষ করেছেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঝড়, এবং সেই আন্দোলনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও জাতির জীবনে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনা, এ সত্য-অনুসন্ধিৎসা কবির শৈশব জীবনে সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তাই জাতির জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রশ্নে যে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন, এসত্য সুকান্তের শৈশব জীবন ভাবনায় পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নি। যদিও

সোভিয়েত রাশিয়া ও তার লাল ফৌজের টুকরো টুকরো কাহিনী ইতিমধ্যেই সুকান্তের কানে এসে পৌঁছেছিল, কেননা তাঁর এক অগ্রজ ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিষ্টপার্টির সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সূত্রে দাদার বন্ধুদের বাড়ীতে আনা-গোনা এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা থেকে সমাজত-ান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস সম্পর্কে নানা কহিনী শুনে সুকান্তের শৈশব মনে সাম্যবাদী চিন্তার বীজ বোনা হতে থাকে। কিন্তু তবু কিশোর সুকান্তের মনে এই নতুন চিন্তা সম্পর্কে নানা দ্বন্দ্ব ছিল, দ্বিধা ছিল, সময় সময় প্রশ্ন উঠেছে মনে। তাই বুঝি আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ কবির মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন জাগে ঃ

বিজিগীষা ?—সন্দিহান আগামী দিনেরা
দৃষ্টি পথ অন্ধকার,—(লাল-সূর্য মুক্তির প্রতীক ?
আজ তবে প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্য বাসর।)

শৈশবের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়িত কবির জীবন মানসের অপূর্ণতা, শৈশবোত্তর জীবন সাধনায় সুকান্তের সমাজচেতনার পূর্ণতা ও তার মূল সুর ধরা পড়ে।

[শিল্প যাতে জনগণের সংযোগে এবং জনগণ যাতে শিল্পের সংযোগে আসতে সক্ষম হয় সেজন্য আমাদিগকে সর্বপ্রথম শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাধারণমান উন্নত করতে হবে।]

- লেনিন

সমকালীন সমাজ-চিন্তা

[সাহিত্যকে শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হ'তে হবে। ফ্যাসিজম, আধা-ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে, জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে হবে, তাদের বিপ্লববাদের শিক্ষা দিতে হবে। ·········লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যে বিরাট বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, সাহিত্যের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করা। সাহিত্যের মূল সার্থকতা এখানে-ই।]

—জর্জি ডিমিট্রভ

সমকালীন সমাজচিন্তা

সুকান্ত কাব্যে সমাজচেতনা প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই কবির সমসাময়িক সমাজ-জীবনের মূল দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সুকান্তের কবি মানস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাঙলা তথা ভারতের সামাজিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাসের সার্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি কতটা সচেতন ছিলেন এ প্রশ্নের গভীরে না যেয়ে ও এ কথা অনায়াসে বলা চলে যে কবি তাঁর নিজের দেশ ও সমাজ এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আর পরিচয় ছিল, জাতির বুকে সমাজ-জীবনে, শোষণ-বঞ্চনার নিয়ত যন্ত্রনার সাথে।

এ কথা অবশ্যই স্মরণ-রাখা প্রয়োজন যে, বিশ শতকের চল্লিশের দশক, ভারতের জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়। একদিকে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে নিত্য-নূতন সমস্যার দ্রুত উত্থান-পতন; অপরদিকে ভারতের রাজনীতিতে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। প্রায় দু'শো বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানি বহন করে অবশেষে জাতির জীবনে মুক্তির পিপাসা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দুশ্চর সাধনায় রূপ নিয়েছিল। বিশেষতঃ বাংলাদেশের সুদূর গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র হৃদয়তন্ত্রীতে অপূর্ব-গুঞ্জরণ তুলেছিল। এ কথা স্বীকার্য যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার কবলে পড়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত দেশ ও জাতির মুমূর্ষু জীবনে মুক্তির স্বপ্ন জাগা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়, কিন্তু এই মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে ঘরে ও বাইরে বাধা ছিল প্রবল। তবে এ সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করার প্রশ্নে, ইতিমধ্যেই দেশের সংগ্রামী জনতার মনে অনমনীয় দৃঢ়তা ও অদম্য উৎসাহ এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষা রূপ পেতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতের ইতিহাসে সেই যুগসন্ধিক্ষণে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায়,—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নানা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পরবর্তী আলোচনায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়বে। তবে একথা স্বীকার্য যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম

দিকে দেশের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সেই সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশের স্বাধীনতা স্পৃহার জোয়ারের টানে সমাজের খেটে খাওয়া নিরন্ন অসহায় চাষী ও মজুর এবং শ্রমিক শ্রেণীও নিজেদের জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪২ সালের ৭ই-৯ই ফেব্রোয়ারী অখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কানপুরের অধিবেশন এবং ১২ই-১৩ই ফেব্রোয়ারী অখিল ভারতীয় কিষাণ সভার ওয়াকিং কমিটির অনুরূপ কেন্দ্রীয় কিষাণ পরিষদের নাগপুরের অধিবেশনের কথা। ভারতের রাষ্ট্রজীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকটের নানা জটিল দ্বন্দ্ব কিষান ও মজদুর সভার অধিবেশন দু'টিতে সাধারণ শ্রমিক ও কিষাণের জীবনে অনেক পরিমাণে সম্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই মূলনীতিই যে মজদুর-শ্রেণীর জীবনের মূলমন্ত্র, এ-সত্যবস্তুকে দুটি অধিবেশনে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়। তারা উপলব্ধী করে, মজদুরের স্বদেশভূমিতেই মজদুরের জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা মিলে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মহলের কারো কারো চোখে এই ঘোষণা প্রকাশ্য রাজনৈতিক শ্লোগান বলে ধরাপড়েছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর এই শ্লোগান তাঁদের মনঃপূত ছিল না।

এ কথা স্বীকার্য যে বাস্তবে, সমাজে প্রত্যক্ষ শোষণের সঙ্গে দেশের এ সমস্ত সর্বহারা শ্রেণীই বিশেষ ভাবে জড়িত,—আর এ কঠিন সত্যকে সংখ্যায় অধিক না হলেও ধীরে ধীরে তারা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ভারতের কিষাণ ও শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্রে 'মজদুরের স্বদেশ ভূমি' গড়ার অনমনীয় দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ মানসিকতা সেই রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণেও প্রকটভাবে লক্ষিত হয়নি। এই প্রশ্নে বলা যেতে পারে যে, দেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে নানা অন্তরায় ছিল। বিশেষতঃ 'মজদুরের স্বদেশভূমি' সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পর্কে এ দেশের মজদুরশ্রেণীর বিশেষ জ্ঞানের অভাব ছিল। সমাজতন্ত্র,—এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ ও ভূমিকা এবং তাছাড়া সেই সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সমাজজীবনে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্থান ও কর্তব্য সম্পর্কে 'মজদুরের স্বদেশ ভূমির' শ্রমিকের পক্ষে সঠিক জ্ঞানের পরিসর যতটা সহজলভ্য পরাধীন বা ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক বা কিষাণের পক্ষে সেই জ্ঞান লাভ ততটা সহজ সাধ্য নয়। আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিক

শ্রেণী একদিকে বৃটিশ ভারতের শাসক গোষ্ঠীর কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণে এবং অপরদিকে জাতীয় নেতৃবর্গের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের প্রবল অনীহায় শোষণ ও বঞ্চনার বাস্তব কারণ সমূহ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। এই প্রসঙ্গে বলতে দ্বিধা নেই যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা-দিবসের শপথবাণীতে ভারতের পূর্ণ স্বরাজের কথা বললেও সেই স্বাধীনতার মূললক্ষ্য ছিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লাভের প্রশ্নে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে আত্ম—নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার অর্জন। যদিও কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নে বলেছেন :

> "...The British Government in india has not only deprived the Indian people of their masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually."

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই নীতির জন্যই কংগ্রেস বলেছিলেন :

> "We believe, therefore, that India must sever the British connection and attain Purna Swaraj or Complete Independence."

কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কংগ্রেসের সেই পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতার শ্লোগান কাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল! কেননা প্রসঙ্গতই বলতে হয় আজও ভারতের জনসাধারণ তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার আড়ালে অর্থনৈতিক দাসত্ব পালন করে চলেছে আর তারই যোয়াল বহন করে চলেছে দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। প্রসঙ্গান্তরে এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, দেশের শ্রমিক কৃষককে তাঁদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষিত করার কাজে দেশের অভ্যান্তরে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত রাজনৈতিক দলের বিশেষ এক ভূমিকা থাকে। বিশেষতঃ মজদুরের স্বাধীনরাষ্ট্রে' দেশের শ্রমিকের চোখে, পৃথিবীর বিপ্লবী শক্তি ও পৃথিবীর প্রতিবিপ্লবী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের সংঘর্ষে রক্তাক্ত সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত যে বিপ্লবী শক্তিরই চূড়ান্ত জয় অপেক্ষা করে আছে, সে সত্য ধরা পড়ে। তাই স্বাধীন দেশের স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণী, দেশ বিদেশের বিপ্লবী শক্তি যাতে সক্রিয় হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার অন্তর্বিরোধ শেষ না হয়,—যাতে বর্বরতম অধিক শক্তিশালী ধনিক রাষ্ট্র ও তার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিচ্ছিন্ন করে সমূলে উৎপাটন করা চলে তার জন্য. 'দুনিয়ার মজদুর এক

হও' এই মূলমন্ত্র সামনে রেখেই শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিকঐক্য গড়ে তুলতে এবং শ্রমিক রাষ্ট্রের নির্বিঘ্নতা বজায় রাখিতে আমরণ সচেষ্ট থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর এই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে যেমন রাজনৈতিক বাধা ছিল তেমনি অপরদিকে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও বাস্তব অসুবিধা ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বলতে হয় যে দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষিত করায় ভূমিকায় শ্রমিক শ্রেণীর ভ্যানগার্ড বা অগ্রদূত রূপে দেশের শ্রমিক স্বার্থ-সংরক্ষণশীল শ্রমিকপার্টি থাকা আবশ্যক।

ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রজীবনে সর্বহারা শ্রেণীর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন ভারতের কমউনিষ্ট পার্টি তখন বৃটিশ ভারতে বে-আইনী বলে ঘোষিত। ১৯৪২ সালের জুলাই অবধি, দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে ভারতের কমিউনিষ্টপার্টি বে-আইনী সংগঠন রূপে ঘোষিত ছিল। তখন বৃটিশ সরকারের এই ঘোষিত নীতির ফলে স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে যে, তৎকালীন বৃটিশ ভারতের বড়লাট দেশের অভ্য-ন্তরে জন-জাগরণ ও গণআন্দোলনের আশঙ্কা করেছিলেন। কেননা দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংকট তখন তীব্রতর হতে সুরু করে,—খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা জন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে—আর তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ দেশের সর্বহারা শ্রেণীর মনে আতঙ্ক বেড়ে ওঠে। ভারতের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের জীবনে যখন এই চাপা বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত, তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও জটিলতা দিন দিন তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যভাগে জার্মানীর পোলাণ্ড আক্রমনের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক কালের সূচনা হ'ল। এই মহাযুদ্ধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বই বাড়িয়ে তুললনা উপরন্তু এই রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একমাত্র শ্রমিক-দের স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশের সঙ্গে পরস্পর সহযোগিতার চুক্তিতে মিত্রপক্ষ যে গড়ে উঠল—তাতে গ্রেট-বৃটেন, আমেরিকা ফ্রান্স একে একে যোগ দিলেন আর অপর দিকে জার্মানী, জাপান ও ইতালী একযোগে মিত্রশক্তির প্রতিপক্ষরূপে ফ্যাসিষ্টগোষ্ঠী গড়ে তুলল। তাই এই মহাযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সমাজজীবন চরম সংকটের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। অপরদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব টিকিয়ে রাখা ও একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। [illegible]

সাম্রাজ্যবাদী ও তার উপনিবেশিক রাষ্ট্রের শ্রমিক, কৃষক ও নিরন্ন সাধারণ অসহায় মানুষ, পাশাপাশি তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায়, শ্রমিকদের স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশের যুদ্ধনীতি ও রণকৌশল এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাছাড়া দেশ ও জাতির প্রতি রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও বাস্তব উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রমিক, কৃষক সাধারণ নিরন্ন, অসহায় সর্বহারা শ্রেণীর জীবনে এই বিপ্লবাত্মক পরিণতির শুভ সূচনায় সাম্যবাদী আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ জননায়কদের যে বিরাট ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কেও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সর্বহারা শ্রেণীর জীবনে ও মননে রূপভেদ দেখা দিল। শোষন ও বঞ্চনার নিত্য যন্ত্রণার অবসান যে নতুন সমাজ ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে, এ সত্য সাধারণের জীবনে ধীরে ধীরে আভাসিত হতে থাকে। তাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ মানুষের জীবনে চাপা বিক্ষোভ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবহাওয়ায় তপ্ত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে জনজীবনে রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে না এবং তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আসে না। তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে যদি দেশের মানুষের সমান অধিকার না থাকে, তবে সে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কোন মূল্য সূচিত হয় না। কেননা জাতির জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরকরূপে চিহ্নিত হতে থাকে। পরাধীন বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবনে অধিকার প্রশ্নে এ দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্যেরই অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ভারতের ক্ষেত্রে ও একথা প্রযোজ্য।

বৃটিশ ভারতের জাতির জীবনে এই পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের পুরোভাগে তৎকালীন ভারতের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহাত্মাগান্ধীর পূর্ণ 'স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতার' আদর্শে সেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অনেকেই মোহগ্রস্ত ছিলেন। 'স্বরাজ' প্রশ্নে গান্ধীর বক্তব্য ছিল:

> "আমার ধারণার 'স্বরাজ' সম্পর্কে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। ইহা বিদেশী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকিবে এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। সুতরাং একদিকে আপনাদের থাকিবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর অন্যদিকে থাকিবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইহার আরও লক্ষ্য থাকিবে। উহার একটি হইল রাজনৈতিক এবং সামাজিক অনুরূপ লক্ষ্য হইল ধর্ম অর্থাৎ সর্বোত্তম অর্থে ধর্ম।......৫"

আর, গান্ধীর চোখে 'স্বাধীনতার' স্বরূপ হ'ল :

> "আমার স্বপ্নের স্বাধীনতা হইল রামরাজ অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব।......"
>
> স্থূলভাবে বলিলে, স্বাধীনতা হইবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক।
>
> 'রাজনৈতিক' কথার অর্থ যে কোন প্রকারে বৃটিশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি।
>
> 'অর্থনৈতিক' কথার অর্থ ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও পুঁজি এবং তাহাদের প্রতিরূপ ভারতীয় পুঁজিপতি ও পুঁজি হইতে মুক্তি।...দেশের দারিদ্রতম মানুষ ও যেন নিজেকে উচ্চতমের সহিত সমান বলিয়া অনুভব করে। ধনিকেরা এবং পুজিপতিরা যদি তাঁহাদের ধন ও কর্মনৈপুন্য দেশের দরিদ্রতম ও দীনতম ব্যক্তিদের সহিত ভাগ করিয়া নেন তবেই ইহা সম্ভব।......৬" (হরিজন ৫-৫-৪৬)

ভাববাদী চিন্তাদর্শই গান্ধীর চিন্তাদর্শকে প্রভাবিত ও আলোকিত করে রেখেছে। 'স্বরাজ' ও 'স্বাধীনতা' প্রশ্নে তাঁর ভাববাদী আদর্শের আবর্তে দেশের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই ঘুরপাক খেয়েছেন। তাই জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতিতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের (অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে) কথা উল্লেখ থাকলেও জাতির জীবনে পূর্ণ অর্থনৈতিক—স্বাধীনতা লাভের কোন বাস্তব পরিকল্পনা ছিল কিনা আজ দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে শিখেছেন। বর্তমান শতকের তিরিশ দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত গান্ধীর চিন্তাদর্শকে সামনে রেখে তাঁর ভাবমূর্তিকে জনজীবনে প্রভাবিত করে কংগ্রেসের মধ্যে এক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে; কিন্তু তবু তিরিশ দশকের মাঝামাঝি হতেই কংগ্রেসে এক পাল্টা নেতৃত্ব গড়ে উঠতে থাকে। এই পাল্টা নেতৃত্বই পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে 'অগ্রবর্তী অংশ' রূপে চিহ্নিত হতে থাকে। গান্ধীর চিন্তাদর্শের পরিপন্থী কোন নূতন পরিকল্পনা বা আদর্শই কংগ্রেসে গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত না। সব ক্ষেত্রেই গান্ধী তাঁর স্বমতে থাকার দৃঢ় মনোভাবের ফলেই অনেক সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে ৭—কিন্তু তিনি তাঁর মত পরিবর্তন সহজে করতে চাইতেন না। বিশেষত, স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে, আন্দোলনগত নীতি নির্ধারণে, গান্ধীর অহিংস নীতির

পরিবর্তন প্রয়াসী কর্মনীতির ধারক ও বাহকদের তিনি বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। প্রসঙ্গতই, ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে গান্ধীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

"পট্টভী সীতারামিয়ার পরাজয় আমার নিজের পরাজয়।"৮

এই মন্তব্যের মধ্যেও গান্ধীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের বিরোধ ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ এরূপ চরম আকার ধারণ করে যে শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যকার অগ্রবর্তী অংশকে নিয়ে ১৯৩৯ সালে বামপন্থী দলের নায়ক সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠণ করেন। ৯

প্রসঙ্গত, বলা প্রয়োজন যে আদর্শগত দ্বন্দ্বে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র থাকলেও স্বার্থগত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষেই একটা সুবিধা-বাদি ঝোক ছিল। স্বভাবতই সে ঝোঁক দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেই প্রবল ছিল। স্মরণ আছে যে, ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন ১৯৩৫ সালে ভারতের এগারটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্ব (Provincial Autonomy) প্রবর্তনের ব্যবস্থা মেনে নেন। ১৯৩৭ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৫ সালের প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশগুলি কার্যে পরিণত করেন। সে ব্যবস্থার বলে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বেরার-আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নির্বাচনে বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু এই চারটি প্রদেশ ছাড়া বাকী সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পরে অবশ্য আসামেও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এবং সিন্ধুতে কংগ্রেস সমর্থিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গ আলোচনার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে বলেই আলোচনায় এই অংশ স্থান পেয়েছে। পূর্বেই বলেছি তিরিশ ও চল্লিশের দশকে কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের এই স্বার্থদ্বন্দ্ব ও ক্ষমতালিপ্সা প্রকটরূপ ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই, কংগ্রেসের আদর্শের আড়ালে ব্যক্তি-স্বার্থ, স্বজন-পোষণ, মোসাহেবী প্রাধান্য পেতে থাকে। গান্ধীর একটি মন্তব্যে সে সত্য উজ্জলরূপে ধরা পড়ে :

"... কংগ্রেসের হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে কংগ্রেসীরা তাহা হজম করিবার যোগ্য নয়। সকলেই চায় গদীর অংশ। আর সেইজন্য কমিটিগুলি দখল করিবার জন্য অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ইহা স্বরাজ অর্জনের পথ নয় আর এই ভাবে সরকারী পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে না।" ১০

কংগ্রেসের মধ্যকার এই সুবিধাবাদী ঝোঁক ও স্বজন-পোষণ-নীতি, পরবর্তী কালে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বের কারো কারো মনে 'রামরাজ্যে'র পরিকল্পনা থাকলে ও কংগ্রেসের কাছে সেই 'রামরাজ্যের' প্রতি কোন আনুগত্যই ছিল না। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার লাভ। গণ আন্দোলন বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে সাধারণ সংগ্রামী মানুষের মধ্য থেকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। কংগ্রেস এ ধরণের নেতৃত্ব গড়ে ওঠার কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই একদিকে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস আলোচনা এবং অপরদিকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনই ছিল কংগ্রেসের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুলনীতি। এ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচীতে, কংগ্রেসের পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতাই বিশেষ করে নজরে পড়ে। ফলে জাতীয় গণতন্ত্র পতিষ্ঠার নামে দেশীয় মুষ্ঠিমেয় পুঁজিবাদী গোষ্টীর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ন্ত্রণের নিরব মন্ত্রণাই ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। আর তারই স্বপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, স্বাধীন ভারতের সাতাশ বছরে দেশের মূল অর্থনীতিক আধিকার নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করছে পঁচাত্তরটি পরিবার।

ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের এই ধরণের ভূমিকার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দলরূপে মুসলিম লীগেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। স্মরণ আছে যে মহম্মদআলি জিন্নার নেতৃত্বে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ দল ১৯৩০-৩১ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশকে নিয়ে 'পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার দাবী তোলেন। পরে বাঙলা, আসাম এবং হায়দরাবাদকেও এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন ওঠে। ১৯৪০ সালে লাহোর সম্মেলনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী আরও জোরদার ও সোচ্চার হ'য়ে উঠে। মহম্মদ আলি জিন্নার এই সাম্প্রদায়িক জিগীর মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। কারণ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষের মর্মমূলে ধর্মের

একাধিপত্য বর্তমান। মিঃ জিন্না, স্বভাবতই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার বাস্তব স্বরূপ ধরা পড়ে, ১৯৪০ সালের ২০শে জুলাই, দিল্লীর মুসলমান ছাত্র সংঘের বক্তৃতায় :

> "..." পাকিস্তানই মুসলমানদের চরম ও পরম কাম্য। ভারতবর্ষকে ভাগ বাঁটোয়ারা না করিয়া আমরা ছাড়িব না ; কংগ্রেস যদি এখনও মুসলমানদিগকে ভারতের এক চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী না হয়, তবে পরে আরও বেশী দিতে হইবে।" ১১

মহম্মদ আলি জিন্নার এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা যদি তারও বিশ বছর আগে ভারতের জাতীয় জীবনের সংহতির দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে কলকাতা শহরে সেই জাতীয় সংহতি ও জনজীবনে মহামিলনের দৃশ্য। কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ভারতের নানা প্রদেশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হয়ে জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এবং স্বরাজ লাভের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। কলকাতায় গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের, বর্তমানে শহীদ মিনারের পাদদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে সত্যাগ্রহের সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে। এই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়-নেতৃত্বের শক্তি ও সংকল্প দেখে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও তার আমলাতন্ত্র গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে! তাই বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড রীডিং জাতীয় ঐক্যের শক্তি দেখে অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে বলেছিলেন :

"I am Puxzled and Perplexd" —অর্থাৎ

"আমি বিহ্বল ও আমি উদভ্রান্ত।" ১২ আর সেই জাতীয়তাবাদী ভারতের সংকল্পের উপর কঠোর আঘাত হানতে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ ও তার উপর নির্ভরশীল কায়েমী স্বার্থবাদীরা দিনের পর দিন, নিবিড় পরিকল্পনায় কত ষড়যন্ত্র ও কৃতঘ্নতা করে জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছে। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে সেই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, জাতির জীবনে বার বার রক্তাক্ত হিংসার উৎসবে মেতেছে। দলমত নির্বিশেষে, এবং যেকোন ধর্ম সম্প্রদায়ের সুস্থসম্পন্ন সদস্যই এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার আবর্তে সংশ্লিষ্ট হতে চান না। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে এ-সত্যই প্রকাশ পায়। কোন কোন সাময়িকীতেও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সেই জাতীয় সপ্তাহ পালনের গুরুত্ব ধরা পড়ে। ১৩

বিশেষতঃ মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা এই দুটি সাম্প্রদায়িক দল প্রসঙ্গে কোন

এক সাময়িকীর 'মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা' শিরোনামায়, সম্পাদকীয় মন্তব্যটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য :

> "এই উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যাঁহারা, তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী এবং জগতের মৃত ও মুমূর্ষু আদর্শ ও ভাবধারার উপাসক।" ১৪

বাস্তবিকই দেশ ও জাতির জীবনে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির হীন চক্রান্তের জাল বিস্তার ভিন্ন সাধারণ মানুষের মঙ্গলচিন্তা, এই দুই দলের কর্ণধারদের মনে ছিল বলে, মনে হয় না। জাতীয়জীবনে হিন্দু-মহাসভার এই নিরর্থক আবির্ভাব জেনে অবশেষে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিজেকে সেই দল থেকে সরিয়ে আনেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস লাভের আশায়, হিন্দু-মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী সভারকার প্রায় অসংযত ভাবেই বৃটিশ শাসকদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগো এ সমস্ত উৎসাহী সহযোগীদের কোন দিনই আমল দেননি।

এ কথা স্পষ্টই স্বীকৃত ছিল যে, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী ভারতের জন-জাগরণের আশু সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসন আর বেশি দিন স্থায়ী হবেনা। তাই জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার হীন ষড়যন্ত্রে তাঁদের গোপন মন্ত্রনা ত ছিলই উপরন্তু সাম্প্রদায়িক লীগ-পন্থীদের কর্ণধারদের মধ্যে পরোক্ষে ইন্ধন যোগাবার সক্রীয় প্রচেষ্টাও ছিল এবং জাতীয় জীবনে এই মতভেদ ও অনৈক্য বজায় রাখাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য ও প্রত্যক্ষশাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বজায় রাখার হীন-কৌশল। মুসলিমলীগ বৃটিশ-শাসকদের এই অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তাই ভারতের স্বাধীনতার দানের প্রশ্নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সহযোগিতার প্রশ্নে কংগ্রেসের প্রস্তাব যখন লর্ড লিনলিথগো পত্যাখ্যান করেন তখন মুসলিম লীগ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যের দরাজ হাত প্রসার করে দেন ; কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রশ্নে নির্বাক থাকায় মহম্মদ আলী জিন্না অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন :

> "আসলে বৃটিশ রাজ কাহারও সহযোগিতা কামনা করে না। কংগ্রেস সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে এবং আইন অমান্য আন্দোলন চালায়। তাহাকে বে-আইনী করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা চিরকালই সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের শর্ত ছিল, যুদ্ধ জয়ের পর আমাদের দাবী পূর্ণ করা হইবে। কিন্তু আমাদের প্রতিও

কংগ্রেসের মত ব্যবহার করা হইতেছে তাহারা মুসলিমলীগকেও বে-আইনী করিতে চায়, তবে আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত।" ১৫

কিন্তু একথা ও সত্য যে, মিঃ জিন্না খুব ভাল করেই জানতেন যে মুসলিমলীগ কখনো বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাবেন না। মিঃ জিন্নার 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম বৃটিশ শাসকের করুণা লাভ ছাড়া যে সম্ভব নয়, এ সত্য জিন্না অনুরাগীদের অজানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ কথাও সবার জানা আছে যে, লর্ড মাউন্টবেটেনের প্রত্যক্ষ করুণার আশ্রয়েই মিঃ জিন্নার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সার্থক হ'ল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের এই পরিণতি সুস্থ চেতনাসম্পন্ন কোন ভারত-বাসীই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি ; একমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদীরাই তাতে উল্লসিত হয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। কেননা অবাধ শোষনের ক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতা যে তাদেরই হাতে এসেছে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা যাঁদের স্মরণে আছে, তারা কি সহজে এ কথা ভুলতে পারেন !—এবং ১৯৪৭ সালের দ্বি-খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই তাঁরা সহজে মেনে নিতে পারেন না যদিও পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান প্রধান অঞ্চল বলে প্রথমে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ নীতিকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেসের 'নরমপন্থী' গোষ্ঠীর নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'চরমপন্থী' দলের নেতা বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে আন্দোলন চরমরূপ ধারণ করতে থাকে। অবশেষে আবদুল রসুল, লিয়াকত হোসেন, মুজিবর রহমান প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই এ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইংলণ্ডের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক অসহযোগ। বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শিক্ষা বর্জন, এই অধ্যায়ের আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জীবনে স্বদেশী-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠী, খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের জাতীয় ঐক্যের মূল উৎস ও তার প্রেরণা-শক্তিকে। সে সময় থেকেই বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী নিবিড় পরিকল্পনা করে, এই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে বিঘ্ন সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিভেদ-সৃষ্টিতে সক্ষমও হয়েছিলেন।

আমাদের এই আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে গেলেও এই আলোচনায় ও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-নীতি

অনুযায়ী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দানের প্রশ্নটি, ভারত সম্পর্কে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর সামনে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক দল ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের তরফ থেকে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি বড়ই জোরদার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেল এবং ভারতসচিব মিঃ আমেরীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে এত তারাতারি ভারতের বুক থেকে বৃটিশ শাসনক্ষমতা লোপ পায় তাই লর্ড ওয়াভেল ও মিঃ আমেরীর চোখে ভারতের সংখ্যালঘু-সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, এবং জাতীয়জীবনে অনৈক্যের প্রশ্ন পরিকল্পিত ভাবে বার বার ধরা পড়ে এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী সদস্যের উত্তরে এই প্রশ্নগুলিকে অতি কৌশলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মূল প্রস্তাব বা আলোচনা থেকে পাশ কাটিয়ে চলতেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভারতের অখণ্ড স্বাধীনতা প্রশ্নে ভারতের জনসাধারণের মনে যত না মতানৈক্য ছিল তার চেয়ে বৃটিশ ভারতের জাতীয় জীবনে অনৈক্য সৃষ্টিতে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র প্রবল ছিল। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রকট করার পরিকল্পনায় লর্ড ওয়াভেল ভারতকে পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর এই তিনটি সেক্টরে বিভক্ত করার নিবিড় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে পূর্বও উত্তর এই দু'টি সেক্টরকেই মুসলমানপ্রধান অঞ্চল বলে সুপারিশ করেছিলেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, বৃটিশ সরকারের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, এবং নিবিড় পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় জীবনে এই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির আত্মঘাতী চেতনা ও মানবিক বিকার সৃষ্টির অপকৌশল সম্পর্কে ব্যক্তি-স্বার্থসিদ্ধি সম্পন্ন ও নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণ প্রয়াসী নেতৃবৃন্দও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির চেয়েও ঐ সমস্ত নেতৃবৃন্দের কাছে ব্যক্তিজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি স্বার্থই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতিতে যে চরম এক সংকট দেখা দিয়েছিল, তার অনিবার্য কারণরূপে দেশের অর্থনীতিতে সংকট আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতঃই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে সে সংকট আরো প্রকট হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ভারতের বুকে ধরা পড়েছিল সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হতে দিন দিন মানুষের জীবনে দুর্বিসহ হয়ে উঠল। দেশের মানুষ অর্থনৈতিক দাসত্বের কবলে পড়ে মুমূর্ষু ও অসহায়ের মত জীবন কাটাতে থাকে। তবু দেশের এই রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে

জনজীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুহূর্তে, দেশের সাম্প্রদায়িক দলগুলি সমষ্টি স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত ও নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের চিন্তাই মগ্ন ছিল। তাছাড়া কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংঘর্ষে যেতে রাজি ছিলেন না। আপোস-মীমাংসার পথে স্বাধীনতা অর্জনের নীতিই গান্ধীর জীবনা-দর্শের মূল লক্ষ্য। আপোস-মীমাংসার প্রতি গান্ধীর গভীর আগ্রহ প্রবল ছিল 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' প্রতিনিধির সঙ্গে এক বক্তব্যেও তা স্পষ্ট ধরা পড়ে:

> "সম্মানজনক ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হইলে, আমি যে কোন ও আপোস-মীমাংসা সাদরে গ্রহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমি যে সর্বদাই প্রস্তুত, বড়লাট তাহা অবগত আছেন।" ১৬

গান্ধীর এই আপোস-মীমাংসা ও অহিংস নীতির প্রশ্নে কংগ্রেসের নরম ও চরমপন্থী পরবর্তীকালে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে যে চাপা বিক্ষোভ ছিল তার প্রকাশ বার বার ঘটেছে তাছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গেও মতবিরোধ সময় সময় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> "তাহাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে মূলগত মতভেদ ধরা পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় আমি আর কংগ্রেসের নীতি নির্দেশ করিতে পারি না।" ১৭

তাছাড়া গান্ধীর 'রামরাজ্য' অর্থাৎ তাঁর স্বপ্নের 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার মূলে যে বিপ্লবের প্রয়োজন, সেই সমাজ বিপ্লবের প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী ভাববাদী কল্পনায় আচ্ছন্ন ছিল। তাই সমাজ বিপ্লবের বাস্তব বাধাগুলি সম্পর্কেও খুব সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। কেবল মাত্র বিদেশী পুঁজির হাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করলেই জাতীয়জীবনে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়ে যায়, এ কথা সমাজ-বাদী বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। পুঁজিপতি মালিক, জোতদার, মজুতদার ও জমিদার শ্রেণীর চরিত্র দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে না,—তাদের মূলনীতিই হলো শোষণ। আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপ লক্ষ্য করি ভারতের স্বাধীনতার সাতাশ বছর পর ও সে শোষণ ব্যবস্থা আজও বর্তমান। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ-জীবনের সেই পুঁজিপতি মালিক, জোতদার, মজুতদার ও জমিদার শ্রেণীর যে বিশেষ প্রভাব ছিল বর্তমানেও সেই সংগঠন সে প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। প্রসঙ্গতই বলতে বাধা নেই যে, কংগ্রেসের সেই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কাছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

ভারতের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে দেশ ও জাতির জীবনে, জাতীয় সন্ত্রাসবাদীদল ও সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের ও একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁদের কাছে পরাধীন ভারতের মুক্তি প্রেরণাই ছিল প্রবল। তাঁদের এই স্বাধীন মুক্ত প্রেরণাই জীবনে কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে এবং মুক্তি যজ্ঞে আত্মবলিদানে দুঃসাহসিকতা জাগিয়েছিল। কত অমূল্য প্রাণ, শহীদের বীর রক্তে অমর হল। যদিও তাঁদের এই আত্মত্যাগের প্রেরণামূলে মহান জীবনাদর্শের ব্রতই একমাত্র পাথেয় ছিল তবু একথা সত্য যে, বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় আত্মীয়তা হয়ত ছিল না। তাই অনেক মহামূল্য প্রাণের আত্ম-বলিদানেও তৎকালীন ভারতের সমাজ-জীবনে ও জন-মনে বিপ্লবীত্মক পরিবেশ ও বিপ্লবী চেতনার উপযুক্ত পরিসর গড়ে ওঠে নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাদের কর্মকৌশল ও কর্মনীতি সম্পর্কে সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারেন নি।

তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদীর চোখে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির উপস্থিতি বহুলাংশে বিরম্বনা বলেই মনে হয়। তাঁদের চোখে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিই হ'ল প্রধান শত্রু। সমাজে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিই সাধারণ মানুষের জীবনে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের মূলে আন্দোলনের বীজ সঞ্চারিত করে এবং শেষ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসন ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবের রূপ নেয় এবং সর্বশেষ পরিণাম জনগণের স্বার্থেই পর্যবসিত হয় এ তত্ত্ব, সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী বেশ ভালভাবেই জানেন। আর তা জানেনা বলেই ১৯৪২ সালের জুলাই মাস অবধি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত করে রাখেন। স্বভাবতঃই বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের রাজনৈতিক কাজকর্ম সমাজের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। তাছাড়া সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে গোপনে কাজ কর্ম করার পেছনে নানা বাধাও ছিল। প্রথমতঃ শাসক গোষ্ঠীর তীক্ষ্ণ নজর ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ জনগণের সামনে মিথ্যা ও অপ-প্রচার ছিল। বিশেষতঃ কমিউনিষ্ঠরা দেশের কথা ভাবে না, বিদেশী প্রভুর কথায় ওরা চলে,—এ সমস্ত উদ্দেশ্যপ্রনোদিত প্রচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা তাদের ছিল না, তাছাড়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলিও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর এই প্রচারের সুরে সুর মিলিয়ে প্রচার কার্যে নেমেছিল। তাই তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির জীবনে ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই চরম প্রতিপক্ষ বিরুদ্ধ শক্তি ছিল। তাই, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর এই

অপ-প্রচারের মুখে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে দেখা যায়।

স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ১৯১৯ সালে মস্কোতে প্রথম কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনেল বা কমিনটার্ণ প্রতিষ্ঠ হয়। এই কমিনটার্ণ গঠন করার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল, অচিরে ইউরোপের দেশগুলিতে বিপ্লব সংগঠিত করা। তাই মস্কোতে কমিউনিষ্ট সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপিত হল। কিন্তু পক্ষান্তরে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জঠর হতে জন্ম হল এক নতুন দানবের। তার নামই হল ফ্যাশিজম। এই ফ্যাশিজমের প্রান সঞ্চার হ'ল ইতালীতে এবং পূর্ণ শক্তি সঞ্চারিত হল জার্মানীতে। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে মানব মুক্তির সম্পূর্ণ আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার এবং প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করে ফ্যাশিজম আবির্ভূত হল। কেবল অর্থনৈতিক জীবনই বিনষ্ট হ'ল না কৃষ্টি সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমাজ-সম্পর্ক সমস্তই ফ্যাশিজমের কবলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই এই ফ্যাসিজমের শিকার হলেন না সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতি শিল্পী গোষ্ঠি ও সেই ফ্যাসিজমের শিকারে পরিণত হলেন। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রমনের প্রধান স্থল হয়ে দাঁড়াল। তাই, এই সর্বনাশা আক্রমণের মুখে কেবলমাত্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকেও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃ এই পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কমিটার্ণ নতুন সংগঠন কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ডিমিট্রফের নেতৃত্বে কমিটার্ণ সম্মিলিত জন-ফ্রণ্ট গঠণের নীতি প্রবর্তন করলেন। এই নীতি অনুযায়ী কমিটার্ণের কায নির্বাহক পরিষদ কমিনটার্ণের সমস্ত সদস্যকে শ্রমিকশ্রেণীর নিষ্ঠুরতম শত্রু জার্মান ফ্যাশিজম এবং তার মিত্র ও তাঁবেদার গোষ্ঠীকে অবিলম্বে ধ্বংস করার জন্য হিটলারবিরোধী সংঘভুক্ত জাতি ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মুক্তি যুদ্ধে নিজেদের সর্বশক্তি সহ সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে এবং সমর্থন দিতে আবেদন করেন।

দেশের এই রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে দেশের অর্থনৈতিক সংকটও দিন দিন তীব্র হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের মূল ভূখণ্ডে যখন জার্মান আক্রমণ সংগঠিত হল এবং অপরদিকে বৃটেনের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির উপর ও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিল তখন স্বভাবতই বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠী নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার তাগিদ বেশি করে অনুভব করলেন। তাছাড়া ফ্যাসিবাদী আক্রমণের হাত থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-

গুলির শাসনক্ষমতার অস্তিত্ব যাতে রক্ষিত হয় সে চিন্তাও তাদের মনে প্রবলই ছিল। এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিই ছিল বৃটেনের অর্থনৈতিক প্রগতির মূল উৎস। এই সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-গুলি হতে খনিজ পদার্থ ও কাঁচামাল রপ্তানী হ'ত আর বৃটেনে উৎপন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সে সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে আমদানী করা হ'ত। ভারতের ক্ষেত্রেও বৃটিশের এই নীতি বর্তমান ছিল—যার ফলে ভারতে বৃটিশ সরকার কোনদিনই কোন বড় শিল্প গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন না। তার নিদর্শন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাক্-স্বাধীন ভারতে বৃটিশ পুঁজিতে কিংবা দেশীয় পুঁজিতেও কোন বড় বা ভারী শিল্প জাতীয়স্বার্থে গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া ভারত সরকারের তরফ থেকে সে প্রচেষ্টার মূলে কোন অনুমোদন লাভের সম্ভাবনা ও ছিল না।

ভারতের মূল অর্থনীতি যেখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল সেই অর্থনীতিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কবলে পড়ে, সমাজে যে মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণীর পরশ্রমজীবী কায়েমী স্বার্থবাদী দল গড়ে ওঠে তাদেরই প্রতারণায় ও হীন ষড়যন্ত্রের ফলে দিন দিন ভেঙ্গে পড়তে সুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী প্রথার এই আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য ও অসামঞ্জস্যতা ফ্লাউদ কমিশনের সদস্যগণের চোখেও ধরা পড়ে—যদিও বলতে দ্বিধা নেই যে কমিশনের সদস্য-গণকে কেউ-ই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন না—অথচ এই বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত সমস্যার ঘটনা ও তথ্য দেখে ফ্লাউদ কমিশন পর্যন্ত চির-স্থায়ী জমিদারী প্রথা সমূলে বিলোপ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে, আইনসভার কলহপরায়ণ ও আত্মস্বার্থান্বেষী একদল সদস্যের হীন-চক্রান্তের ফলে ফ্লাউদ কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ কার্যে পরিণত হতে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। যদিও ১৯৪৩ সালের ১৫ই মার্চ, সোমবার আইন সভার রাজস্বসচিব ঘোষণা করেছিলেন যে, ফ্লাউদ কমিশনের রায় অনুযায়ী—সরকার ভূমির সংস্কার করতে প্রস্তুত হয়েছেন। তবে এর পেছনে আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিমাণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সরকারের এই দুর্বলতা অপরদিকে কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের অন্যায় পীড়ন ও অত্যাচার কৃষিজীবী সাধারণ কৃষকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে জমির উর্বরতারও অবনতি ঘটে, নদী-নালা, খাল-

বিল সংস্কার না হওয়ায় কোন বছর বন্যায়, কোন বছর খরায় জমির উৎপাদন ব্যাহত হতে দেখা যায়। ফলে, গ্রামীন অর্থনীতিতে সংকট তীব্র হতে থাকে। শহরে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দিতে থাকে। একদিকে বেকারী ছাটাই অপরদিকে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদিতে শহর ও শহরাঞ্চল-গুলিতেও জনজীবন বিপর্যস্ত হতে থাকে।

অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাংলার বুকে সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটাল অনিবার্য কারণেই। ১৩৫০-র মন্বন্তর বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জীবনে বিপর্যয়ের এক মহাকাল ঘোষণা করল। সরকারী উদ্যোগে যুদ্ধের রসদ সঞ্চয়ে গ্রাম বাংলার সুদূর অঞ্চল থেকে একদিকে ধান চাল রপ্তানী হতে থাকে অপরদিকে সেই ধান চাল দেশের অভ্যন্তরে জোত-দার ও মজুতদারের গোলায় এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর ঘরে দেশের খাদ্য-সংকটের মুহূর্তে অধিক মুনাফার আশায় গোদামজাত হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই দেশের অভ্যন্তরে অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব দেখা দিল। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের দাম দিন দিন বাড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাধারণমানুষের ক্রয়ক্ষমতার প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করল। দেশের সাধারণ মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে, মুমূর্ষ ও অর্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে। শহরে রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য দাবী তোলা হয় কিন্তু সে দাবী সরকারের কাছে কোন গুরুত্বই পায় না। জনসাধারণের চাপে যদিও শেষ পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে লঙ্গরখানা খোলা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি নগণ্য। বাঙলারএই খাদ্যাভাব ও অর্থসংকট সম্পর্কে বাঙলার ছোটলাট ও ভারতের বড়লাট প্রায় উদাসীন ছিলেন। এদিকে সাধারণ বুভুক্ষা মানুষ বস্ত্রাভাবে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় দলে দলে খাদ্যের আশায় শহরের বুকে আসড়ে পড়তে সুরু করে। মনুষ্যত্ব পশুত্বের কাছে বলি হতে থাকে। গ্রামের পথে-ঘাটে, শহরের রাস্তায়, ফুটপাতে, অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ জমা হতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ যে কত অসহায় ছিল সংবাদপত্রের একটি মন্তব্যে তা ধরা পড়ে।

> "গতকল্য অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া পার্কে এ, আর, পি ডিপোর সম্মুখে একটি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে আবর্জনা ফেলিবার পাত্র হইতে ভিক্ষুকেরা প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য খুঁটিয়া খায়,

একটি ভিক্ষুক রমণী অপর একটি ভিক্ষুক রমণীর সংগৃহীত খাদ্য ছিনাইয়া লওয়ায় শেষোক্ত ভিক্ষুক রমণী পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মাথায় একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আঘাত করে।। ফলে,-তার ক্ষতস্থান হইতে ভীষণ ভাবে রক্ত পড়িতে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।" ২০

অথচ ভারতসচিব মিঃ আমেরী বৃটেনের কমন্সসভায় জনৈক শ্রমিক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে পরিপূর্ণ শঠতার আশ্রয়ে বাংলার এই মর্মন্তুদ দুর্ভিক্ষের কথা অস্বীকার করেন। অথচ ১৩৫০-র দুর্ভিক্ষে বাংলার লোকক্ষয়ের সরকারী হিসাব ছিল ১০ লক্ষের ও বেশী। যদি ও বেসরকারী হিসাবে এই লোকক্ষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২১ লক্ষের ও বেশি। এই দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সংকট ছিল বাংলার বুকে মহামারীর প্রাদুর্ভাব। ১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলকাতা গেজেটের একটি রিপোর্টে সে চিত্র ধরা পড়ে। সে রিপোর্টে বলা হয়, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, খুলনা, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বরিশাল, বীরভূম, বর্ধমান এবং হাওড়া' এই দশটি জেলাতেই মহামারী প্রকটরূপ ধারণ করেছে! ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালের ২২শে জানুয়ারী মিঃ রিচার্ড গার্ডিনার কেসি বাঙলা গভর্ণরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশ ভারতের কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহায়তা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাতেও ভারতে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় আসীন সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্ণধারদের মনে বিন্দুমাত্র ও আস্থা জাগেনি। তবু এ কথা সত্য যে, দেশের জনমতের চাপে পড়ে জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেবার আগেই ৯ই জুন ১৯৪২, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্দী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্ত, ডাঃ রনেন সেন, আবদুল হালিম, মহম্মদ ইসমাইল, নিরঞ্জন সেন, গোপাল আচার্য, আবদুল মোমিন, অপূর্ব মুখার্জী, গোপেন চক্রবর্তী, স্মতিশ ব্যানার্জী প্রমুখকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুখপাত্রগণ ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর ১৯৪২ সালে, দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। সেই সম্মেলনে কোন কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে পুনরায় অবৈধ ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু সভায় স্থির হয় যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে

পুনরায় অবৈধ ঘোষণা করলে নানাদিক থেকে সরকারের সমালোচনা হতে পারে তাই বেছে বেছে কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যদের পুনরায় আটক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অথচ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির শ্লোগান ছিল ঃ

"জাতীয় আত্মরক্ষার এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্য। আমাদের পার্টির শ্লোগান ইহাই। জাতীয় সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়।" ১৮

তাছাড়া তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি একথাও বলেছেন ঃ

"ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে যদি আপনি ইচ্ছুক, বৈদেশিক শাসন পাশ হইতে স্বদেশের মুক্তি যদি আপনার কাম্য, জাপ-আক্রমণ-কারীকে প্রতিরোধ করিতে যদি আপনি বদ্ধপরিকর, তাহা হইলে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করুন, কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তির জন্য জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করুন, ধ্বংস মূলক কার্যকলাপের চেষ্টা হইতে দেশপ্রেমিকদের ফিরাইয়া আনুন, কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জন্য কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, এবং জাতীয় আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।" ১৯

দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, দেশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর আগ্রহ এবং সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ পার্টির এই বক্তব্যে ধরা পড়ে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, ইতিমধ্যেই ভারতে জাপান সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণের প্রতিরোধে কংগ্রেসের অসহযোগ-নীতির ফলে সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দী হতে হয়। এমন কি জাপান-আক্রমণের প্রশ্নে ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর প্রতিরোধের পূর্ণ আশ্বাস দেয়া সত্বেও কমিউনিষ্ট কর্মীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগে বাধাদান, এমন কি সক্রিয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেও তৎকালীন ভারত গভর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নি। এমন কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারী, ছাটাই ও অর্থ সংকট সম্পর্কে সমাজে সাধারণ মানুষের মনে যাতে বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত ও তার প্রকাশ না ঘটতে পারে, তাতেও তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তাই গণ-আন্দোলনের প্রতি ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের খুব ভাবনা ছিল। এই কারণেই, গণ-আন্দোলন ও বিক্ষোভের পরিচালনকারী কর্মী ও নেতৃবর্গের উপর সরকারের নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের নানা কৌশল ও নীতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বড়ই আশার কথা ছিল যে, সরকার

ভারত রক্ষা আইনের বলে গণ-আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর নানা বিধি-নিষেধ, জুলুম-অত্যাচার এবং দমন-পীড়ন চালালেও দেশের শ্রমিক ও কৃষক সমাজে স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্তির স্পৃহা ক্রমশঃই প্রকটরূপ ধারণ করতে থাকে। স্মরণ করা যেতে পারে, বোম্বাই ও আমেদাবাদের প্রায় সমস্ত কলগুলিতে শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কথা। তবু একথা সত্য যে, দেশের শ্রমিক-কৃষক, নিরন্ন-অসহায় সাধারণ সর্বহারা মানুষ শোষণ বঞ্চনার নিত্য-যন্ত্রনার মুক্তিপ্রশ্নে সাধারণভাবেই লক্ষ্যহারা ছিল। কেবলমাত্র অখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও অখিল ভারতীয় কিষাণ সভার মাধ্যমে দেশের শ্রমিক ও কিষাণ শ্রেণীর ন্যূনতম রাজনৈতিক জ্ঞানই দেশের স্বাধীনতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে পরাধীনতার গ্লানিমোচনের একাগ্রতা সৃষ্টিতে সযত্ন প্রচেষ্টা ছিল। যদিও একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকের এই দু'টি গণ-সংগঠনে প্রবেশের অধিকার ছিল সেহেতু, এ দুটি গণ-সংগঠনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতি-নির্ধারণে আদর্শগত প্রশ্নে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের বক্তব্যেও নানা মতভেদ ধরা পড়ে।

বাঙলা দেশের এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জাতীয় জীবনে এক অনিশ্চিত সম্ভাবনা গড়ে তুলল। তাছাড়া জাতীয় চরিত্রে নানা মানবিক ত্রুটি ও নৈতিক বিচ্যুতি ধরা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে ঘুষ, জালিয়াতি, জুয়োচুরি ইত্যাদি নৈতিক নীতি-হীনতা ও বিবেকশূন্যতা প্রকটরূপে জাতীয় চরিত্রে আশ্রয় পেতে সুরু করে।

এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে কেন্দ্র করে বাঙলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনে যে সমস্যা সংকট দেখা দিল সে সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক ও উদারনীতিক সংরক্ষণশীলদের মধ্যে কয়েক জন সদস্য ভারতের খাদ্য সমস্যা ও তার সংকট সম্পর্কে কঠোর ও মৃদু সমালোচনা করলেও তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ আমেরী এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মুখপাত্র স্যার জন এণ্ডারসন দ্বিধাহীন চিত্তে চরম স্বেচ্ছাচারের সাথে ঐ সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও বৃটিশ পার্লা-মেন্টের কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে মিঃ প্যাথিক লরেন্স, মিঃ কোভ, মিঃ সেমুর কক্স, ম্যারজন মুস্টার প্রমুখ সদস্যগণ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

প্রসঙ্গত বলতে দ্বিধা নেই যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মূলনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের চিন্তার বিহ্বলতা তখনো কাটে নি। এক-

দিকে আদর্শবাদী ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতিকামী অপরদিকে ভাগ্যান্বেষী, সুবিধা-বাদী, সকলের সবরকমের আশা-আকাঙ্খার সমন্বয় ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছিল, তাঁদের এই অনির্দ্দিষ্ট জাতীয়তাবাদ কল্পনার সঙ্গে। পরাধীন দেশের কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতার মাধ্যমে আপোস-মীমাংসার গোল-টেবিল বৈঠকে যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে না এই বাস্তব চিন্তা শূন্যতা এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরা এই মীমাংসার প্রশ্নে অহিংসনীতির পৃষ্ঠপোষক ও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি পূর্ণসহযোগিতার পক্ষপাতি ছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের সে আশা ও কল্পনায় চিন্তার বিহ্বলতা কাটেনি। যে শোষণের তাগিদে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের এই সমুদ্র-পারি, অন্ততঃপক্ষে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সেই শোষনের অস্তিত্ব বজায় রাখার ন্যূনতম গ্যারান্টি তাদের আবশ্যক! যুদ্ধ চলাকালীন সে গ্যারান্টিলাভ বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে আশা করা যেমন সহজ ছিল না। তেমনি জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি দান ও সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্বভাবতই জাতীয় জীবনের সহজ ভাবপ্রবণতার মূল অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যবহার করার ইচ্ছায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের চোখে, রুজভেল্ট, চার্চিল, স্ট্যালিন, চিয়াং কাইশেক এক ও অভিন্ন ব্যক্তিত্বে ধরা পড়ে। অথচ এঁদের পেছনে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে যে গভীর আলোড়ন ও নিবিড় ঐক্য সে সত্য ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকের চোখেই ধরা পড়েনি। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে জাতীয় সমস্যা,—তা যে বিশ্বের সমগ্র জাতীয় সমস্যারই অংশ ও তার প্রভাব এবং প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ, এ সত্য সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ বারবারই প্রবল অনীহা প্রকাশ করেছেন।

ভারতের এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে, দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতে গণ-মুক্তির আশা নিয়ে সমাজ-সভ্যতার ও কৃষ্টির চরম শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির চোখে ধরা পড়েছিল সাম্রাজ্য-বাদীর জঠর থেকে উদ্ভূত বিশ্বমানবতা বিরোধী চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসি-বাদের ভয়ঙ্কর আবির্ভাবমূর্তি তাই ফ্যাসিবাদকে রুখতে, দেশের শ্রমিক-কৃষক নিরন্ন সাধারণ অসহায় সর্বহারা মানুষকে যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনে আহ্বান

করেন। সে সময়ে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে সাধারণ মানুষের জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব যে বেশ লক্ষ্যণীয় ছিল তা তৎকালীন বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের অস্তিত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলেই বেশ অনুমান করা যায়। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ-দানের ন' মাসের মধ্যে পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ষোল হাজার তাছাড়া এদের পরিচালিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য সংখ্যা তিন লক্ষ ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা উনচল্লিশ হাজার, কিষাণ সভার সদস্য চার লক্ষ, মহিলা সমিতির সদস্য একচল্লিশ হাজার, কিশোর বাহিনীর সদস্য ন' হাজার এবং স্বেচ্ছাসেবক বত্রিশ হাজার। কমিউনিষ্ট পার্টির পেছনে সাধারণ জনসমর্থন প্রবল থাকলেও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল বার বার জনজীবনকে বিভ্রান্ত করার হীনচেষ্টায় কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচারে লিপ্ত থাকে। সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পি, সি, যোশী প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলেন :

> "......এত বড় সংকটের দিনে আমরা নিরপেক্ষ দর্শক নহি ; জাপ আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে নিরাপদ ও দৃঢ় করার জন্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের পার্টি নিরলসভাবে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ করিয়া যাইতেছে। পঞ্চম বাহিনীর ষড়-যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা শ্রমিক শ্রেণীকে সজ্যবদ্ধ করিব। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থ সর্বস্ব নীতি এবং জাতীয় নেতাদের নেতিবাচক নীতি মিলিত হইয়া যে জাতীয় সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে, কমিউনিষ্ট পার্টি তাহার সমাধান করিবে, কেননা আমলাতন্ত্র যেমন ভারতীয় স্বদেশ প্রেমকে পিষিয়া মারিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তেমনি পঞ্চমবাহিনী ও জাতীয় আন্দোলনকে বিকৃত করিয়া ধ্বংস মূলক আন্দোলনে পরিণত করিতে নিষ্ফল হইয়াছে। এই সময় স্বাধীনতা কামীস্বদেশপ্রেমিকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার কর্মধারাই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে।" ২১

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি যখন তাঁর পার্টি কংগ্রেস থেকে যুদ্ধকালীন জাতীয় সঙ্কট সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে জাতীয় কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বদ্ধ-পরিকর তখন অপরদিকে তখন সমাজে এই বৃটিশ শাসননীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফসল রূপে দেশের জমিদার, মহাজন, জোতদার, বৃত্তিজীবী, চাকুরী-জীবী সম্প্রদায় তাদের উভয়ের পৃথক ও বিপরীত স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও নিতান্ত

ভাবমোহে ঐক্যের প্রশ্নে উৎসাহী হয়ে উঠে। উনিশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ যে বিশ-শতকের সমস্যা জর্জর ভারতের সংকট উদ্ধারে অসমর্থ সাধারণ মানুষ সে সত্যকে তখনও উপলব্ধি করতে শেখেনি। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে স্ববিরোধী ব্যবস্থা ও মূলগত অনৈক্য রয়েছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে জমিদার ও প্রজা, পুজি-পতি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মূলগত যে বিরোধ এই বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় জীবনে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না। মুসলমান কায়েমী স্বার্থ-বাদীরা এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ও সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়েছে এবং পৃথক স্বার্থ চিন্তার আশ্রয় করেছে,-অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক জাতি গঠনে প্রবৃত্ত হচ্ছে। সুতরাং কায়েমী স্বার্থবাদীদের হীন প্ররোচনায় এই ঐস্লামিক জাতীয়তাবাদের ভাবালুতার সঙ্গে উনিশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনুভব করা চলে।

অপরদিকে ভারতের ধনী শিল্পপতি ও পুজিপতি মালিক শ্রেণীর চরিত্রে দ্বি-মুখীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক-রূপে ভারতের স্বাধীনতার উপাসক, ও জাতীয় কংগ্রেসের ভক্ত, অন্যদিকে অতি-রিক্ত মুনাফার লোভে গভর্ণমেণ্টের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগা-যোগ স্থাপনে বিশেষ তৎপর। অথচ এই জমিদার শ্রেণী জোতদার মজুতদার, কাপড়ের মালিক, ইনাসিওর কোম্পানীর মালিক, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তামণ্ডলী, খবরের কাগজের মালিক এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীল আইনজীবী সম্প্রদায় তাছাড়া কায়েমী স্বার্থবাদীরা দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এক নির্দ্বন্দ্ব ভাবালুতা ও চিন্তায় বিহ্বলতা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের জাতীয়তা-বাদের সংঘর্ষকে বিচ্ছিন্ন এক ঘটনা ও সমস্যা বিবেচনা করে মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে এসেছেন। পৃথিবীর মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ ও তার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে পৃথিবীর শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের সংঘর্ষের সাথে ভারতের সংঘর্ষ ও মৌল-ভাবে জড়িত। তাছাড়া এই সংঘর্ষের মূলপ্রেরণা হল অর্থ নৈতিক ;—এর পেছনে কোন অতীন্দ্রিয় লোকের প্রেরণা ছিল বলে মনে হয় না, কেননা এই লৌকিক জগতে মানুষের জীবনে বাঁচার তাগিদই প্রবল ছিল।

মানব মুক্তির এই প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য দেশে দেশে ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এই আদর্শ অনুসরণ করেই ফ্যাসিবিরোধী গণ জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের ১৯শে ও ২০শে তারিখ কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে বাঙলা ও বাঙলার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশের বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেন। এই ফাসিবাদীর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

> "......এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না। নির্মম, ক্রুর, সার্থান্ধ এক যুথবর্দ্ধমানব সম্প্রদায়। দৈহিক এবং সর্বপ্রকার আসুরিক শক্তিতে হিংস্র ক্ষুধায় তারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে পদানত করবে; তারা হবে প্রভু, কর্তা, দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা; আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের গোলামী করবে; যে ধারায় তারা চিন্তা করবে সে ধারায় মানুষকে চিন্তা করতে বলবে—যে রীতি ও নীতি তারা প্রবর্তন করবে সেই রীতি ও নীতি অনুযায়ী সমাজকে চলতে হবে, সামরিক নিষ্ঠুর বিধি বিধানে তার ক্ষীণতম প্রতিবাদের দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা, কাব্য সাহিত্য, দর্শন, শিল্প এক কথায় সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পথরুদ্ধ হবে।...এমন কুট-কৌশলে রচিত ধন—বণ্টন ও ব্যবস্থার উপর এদের নববিধান রচিত হবে যে, এক পুরুষ কি দু' পুরুষ পরে মানুষ আর কল্পনাই করতে পারবে না যে সাম্য—মৈত্রী ও স্বাধীনতায় এদের অধিকার আছে, উন্নততর জীবন, বৃহত্তর কল্যাণ, মহত্তর কল্পনা, সুন্দরতর সম্ভাবনার সাধনার কথা মনে করতে তারা শিউরে উঠবে। এক কথায় মানুষের জীবনের সুদীর্ঘ গৌরবময় উর্দ্ধমুখী প্রেরণা এবং আত্মদানের যজ্ঞের বিরুদ্ধে এতবড় আসুরিক অভ্যুত্থান আর পৃথিবীর ইতিহাসে হয়নি।" ২৩

দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকের চোখে এ সত্য ধরা পড়েছিল। কিন্তু এই বিশ্বমানব ও মানবতাবিরোধী চরম প্রতিক্রিয়াশীল নিষ্ঠুর ধ্বংস কামী ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনশক্তির সংগঠনে ও নানা বাধা ছিল,—তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর আমলাতন্ত্রী শাসনবিধির ভ্রান্ত ও আত্মগর্বী নীতিও জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টির কারণ হয়ে

ওঠে। তবু এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরকালে মাতৃভূমির ঘোর সংকটের মুহূর্তে দেশ ও জাতির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও ফ্যাসিবাদই চরম শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকগোষ্ঠীর চোখে এ সত্য ধরা পড়েছিল। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম নিজের দেশ ও জাতিরই মুক্তি সংগ্রাম নয়—এ সংগ্রাম ছিল বিশ্বজনগণের মুক্তি সাগ্রাম। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই হয়ত ভবিষ্যত স্বপ্নসার্থকতার আশা-বানী উচ্চারণ করেছেন—

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস ;
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে সংগ্রাম তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

ঐকতান : রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যুদ্ধ পরিস্থিতির বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণে এবং দেশের জনশক্তির সংগঠণে সঠিক নেতৃত্বদানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ একমত হতে পারেনি। দেশ ও জাতির এই সংকট মুহূর্তে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চিন্তাধারায়ও নানা মতপার্থক্য ধরা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সদস্যই দেশরক্ষা আইনের বলে গ্রেপ্তার হন ;—এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লক্ষ্য করা যায়—প্রাদেশিক নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীরদের মধ্যে। কংগ্রেসের এই উপরতলার নেতৃত্বের অবর্তমানে অধস্তন নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে চিন্তাধারার নানা বৈষম্য দেখা দিতে থাকে। এই যুদ্ধে, ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে সহযোগিতার অর্থ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কে সমর্থন করা নয়,—পরন্তু ফ্যাসিবাদী আক্রমণের হাত থেকে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত রক্ষা করে জনগণের শক্তি ও জনগণের অধিকারবোধ জাগ্রতকরা এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাত থেকে শাসনতান্ত্রিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনে জনগণের নেতৃত্ব কায়েম করাই মূল লক্ষ্য ;—এ প্রশ্নে প্রায় উদাসীন ছিলেন। এ কথা হয়ত বা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি যে, চল্লিশের এই যুগলক্ষিক্ষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে জাপ ফ্যাসিজমই ভারতের প্রধান শত্রু ছিল।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘূর্ণিপাকে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাও ছিল নানাভাবে উল্লেখ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনে বিপর্যয় সুরু হয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী দিন দিন বিপর্যস্ত হতে থাকে। এক দিকে বেকারী বৃদ্ধি, অপর দিকে চাকুরী ও বৃত্তিতে উপার্জন হ্রাস, ইত্যাদি কারণে মধ্যবিত্ত সংসারের সচ্ছলতা হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া ব্যক্তিগত আয়ের বৈষম্য হেতু বাঙলার মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে আরম্ভ করে। অপর দিকে মহাযুদ্ধের নানা চাতুরী ও কালোবাজারী মুনাফালব্ধ অর্থে সমাজে এক শ্রেণীর বিত্তশালী ধনী ক্রমশঃ ফেঁপে উঠতে থাকে। অপর দিকে জমিদারশ্রেণী দিন দিন মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে সহরের অলিতে গলিতে সুখবিনোদনে আগ্রহী হয়ে উঠে তাছাড়া একদিকে শিক্ষিত বেকার যুবকের জীবনে যেমন হতাশা বাড়তে থাকে, অপর দিকে যুদ্ধোত্তরকালীন দ্রুত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত না হবার ফলে সমাজের প্রচলিত পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের ঠাঁই করে নেবার প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। কিন্তু তাতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে ব্যর্থতাজনিত গ্লানি প্রকট হতে আরও দেখা যায়। তাই বর্তমান জীবন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় জীবন বিকাশের পরিকল্পনা ছেড়ে অতীত কল্পনায় মানসিক সান্ত্বনালাভে যত্নবান হতে দেখা যায়—অথচ বড়ই পরিহাসের ব্যাপার যে, এঁরা পুরাতনকেও আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে পারছে না। এই অবাস্তব কল্পনায় আচ্ছন্ন চিন্তার ফলেই বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে বিহ্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই মানসিক বিহ্বলতার অবস্থাতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল আঘাত নেমে এল। দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু মধ্যাবত্তশ্রেণী এই আঘাত সহ্য করতে সক্ষম ছিল না। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে সমস্ত বিরুদ্ধতা ও দ্বন্দ-সংঘাত দিন দিন পুঞ্জিভুত হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবির্ভাবে নতুন ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি যেন তার মূলে বিস্ফুরণ ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। অর্থের কাছে মনুষ্যত্ব তার অধিকার হারাতে বসেছে। সমাজের একাংশের ন্যায়-নীতি বিবর্জিত পাপস্ফীত অর্থই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শোষণ করে ক্রমে ক্রমে দারিদ্রে পরিণত করে চলেছে। অপরদিকে সমাজে বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই অর্থ ও দারিদ্র্যের এই আত্যন্তিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, মূলতঃ পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষতঃ পরাধীন দেশের একটি মধ্যবিত্তশ্রেণী

(বর্তমান নিম্ন মধ্যবিত্ত) কোন ভাবেই টীকে থাকতে পারে না। কিন্তু অপর-দিকে এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে হৃদয় প্রকৃতিতেও প্রতিরোধের কোন বলিষ্ঠ মানসিকতারও সন্ধান পাচ্ছেন না। অথচ সমাজ জীবনে এই শোচনীয় অবস্থায়, জাতির জীবনে চরম সংকট মুহূর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত থাকা ছাড়া জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব জীবন-দৃষ্টি এবং সে সমস্ত সমস্যা সমা-ধানের উদার ও প্রগতিশীল চিন্তা তাছাড়া বলিষ্ঠ মানসিকতা তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বের কাছে আশা করা বড়ই কঠিন ছিল। সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে সঠিক নেতৃত্বের অভাবই বার বার স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঝড়ের মুখে, নাবিক-বিহীন অসহায় যাত্রীদের মতো লক্ষ্যহারা মধ্যবিত্তশ্রেণী সঠিক লক্ষ্যের নিশানা কোন কালেই পায়নি। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বজড়িত মানসিক অবস্থা কেবলমাত্র বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের পরিণতি নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনেও এই পরিণাম অল্প-বিস্তর বর্তমান ছিল।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির ভারতীয় আমলাদের চোখে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল। অপরদিকে ভারতের নিরন্ন সাধারণ অসহায় মানুষের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের খণ্ড প্রকাশও লক্ষ্য করেছিলেন। বৃটিশ আমলাতন্ত্র অন্ততঃ পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পেরেছিলেন যে ভারতের জাতীয় জীবনে অনৈক্য, নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এই সমাজে বর্তমান থাকলেও সমাজে শোষিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির স্পৃহা দিন দিন সঞ্চীত হতে থাকে। তাই জন জাগরণ ও গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা আশঙ্কা করেই ভারতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি 'ভারত রক্ষা আইন' সহ নানা জন-বিরোধী আইন প্রয়োগ করে সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের সংগ্রামী সাথী ও নেতৃত্বের উপর নানা রকম বাঁধা নিষেধ আরোপ করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মুজফফর আমেদ এস, এ, ডাঙ্গে, বি, টি, রণদিভে এবং এস,এস, মিরাজকরের গতিবিধির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের কথা। তাছাড়া ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও তখনও পার্টীর ৬৯৫ জন সদস্য কারারুদ্ধ এবং ১০৫ জন অন্ধ কারাগারে যাবজ্জীবন বন্দী ছিলেন। ২৪

তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও কর্মীদের জীবনেও গতিবিধির এই নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল বর্তমান ছিল। তাছাড়া বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি মোটামুটি সচেতন ছিলেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থেই কংগ্রেসের কর্মসূচীও তার নেতৃত্বকে অধিকতর গুরুত্ব দেবে এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতে বৃটিশ

শাসন ক্ষমতায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কা করেই ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধা অধিবেশনে (৬ই জুলাই—১৪ই জুলাই, ১৯৪২) ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি (ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নামী অন্যতম) কার্যে রূপায়িত করার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২ নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন শুরু হয়,—সে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সহ জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সদস্যই গ্রেপ্তার হ'ন।

আর বিস্তৃত আলেচেনার গভীরে না গিয়ে আমরা কি একটু মনে করতে পারি না যে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর মোটেই কোন সদিচ্ছা ছিল বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নে, জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের গোল-টেবিলের আসরে আলোচনার পথ খোলা থাকলেও সে সমস্ত আলোচনার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠা ছিল না। তৃতীয়তঃ ভারতে বৃটিশের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে উপযুক্ত গ্যারান্টির বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর পূর্ণ আস্থা গড়ে ওঠেনি। চতুর্থতঃ, চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের নাগপাশ হতে মুক্তির প্রশ্নে দেশের সাধারণ মানুষের মনে যে স্বাধীনতা স্পৃহা স্ফীত হতে থাকে তাতে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের আশঙ্কা করেছিলেন, আর সেই সাধারণ মানুষের মনোবলকে শিথিল করে তুলতেই নানা রকম দমন-পীড়ন অত্যাচার ও ভারতরক্ষা আইনের অপ-প্রয়োগে বাধ্য হয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ, জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রশ্নে, সর্ব রকমের কূট-কৌশল ও হীন প্রচেষ্টা দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অথচ, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাব ও তাদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের সত্য উদ্ধারে জাতীয় কংগ্রেস অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া অস্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে অনেক জাতীয় নেতাই সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মৌলপার্থক্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তারা হয়ত ভাবেন নি যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে জয়পরাজয়ের ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এবং মানবতার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ও শত্রু-

রূপে নবাবী শাসনব্যবস্থা ছিল না বরঞ্চ প্রধান শত্রু ছিল বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী এবং তার শাসন ক্ষমতার প্রভাব। এ সত্য নির্ধারণে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে। ১৯৪২ সালের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উদঘাটনে। মানব সভ্যতার বিনাশে সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও ফ্যাসিবাদ যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এ সত্য ভাববাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি।

কিন্তু সমাজে এই রাজনৈতিক চিন্তার সংকট মুহূর্তে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার জঠরজাত মহাদানব ফ্যাসিজমের স্বরূপ সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেন। মানব সমাজের প্রগতি ও কল্যাণের প্রশ্নে এবং বিশ্বের সমগ্র জাতির মুক্তির সংগ্রামে চরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অপর দানবীয় বহিঃপ্রকাশ ফ্যাসিজমের প্রতিরোধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের খেটে খাওয়াসাধারণ মানুষ, দেশের শ্রমিক, কৃষাণ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ইতিমধ্যেই ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সুরু করেছে। একথা সত্য যে প্রায় সবার জীবনে ছিল মুক্তির-স্বপ্ন শিখা। সবাই মনে প্রাণে মৃত্যুর বিভীষিকা হতে পরিত্রাণ প্রয়াসী ছিল। তাছাড়া শোষণ বঞ্চনার-নিত্য যন্ত্রণার এবং যুদ্ধের এই বিব্রত তাড়নায়, জীবনে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে সুন্দর ভাবে বাঁচা এবং জীবনে শান্তি লাভের স্বপ্নে ছিল তারা বিভোর। তাই এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে প্রতি দেশের শিল্পী স্যাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েরও এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। বাঙলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সত্যকে উপলব্ধি করে এবং সেই গুরুত্ব মেনে নিয়েই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন—গড়ে তুলেছিলেন এক ফ্যাসিজম বিরোধী সংঘ।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের এই সামাজিক পটভূমিতে কবি সুকান্তের আবির্ভাব। কবি ও কর্মী সুকান্ত একই জীবনদৃষ্টির পূর্ণ স্বাক্ষর। তাঁর এই আবির্ভাব আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। যুগচিন্তা ও যুগ-মানসই কবি সুকান্তকে কর্মী সুকান্তে এবং একে অপরের পরিপূরকরূপে জীবনে বিকাশের সুযোগ ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যেই কবির শৈশবজীবনে যুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘ:টছিল তাছাড়া বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, দীনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সমর সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, নরেন্দু রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, ডাঃ নারায়ণ রায়, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকা-

নন্দ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, হীরেন মুখার্জী, সত্যেন মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জী, সরোজ বন্দোপাধ্যায় এবং দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি শিল্পী এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ছিল। তবু একথা স্বীকৃত যে, পরিচিত এই শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে মনন-চিন্তার ক্ষেত্রে সুকান্তের স্থান পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তাই সমকালীন সমাজ চিন্তার আসরে সুকান্তের জীবন সাধনা যেমন বৈশিষ্ট পূর্ণ ছিল তেমনি সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা রূপায়ণে জীবনের কর্মভাবনা ও সক্রিয় ছিল। মননে ও চিন্তায়, কর্মে ও সাধনায় সুকান্তের জীবনের এই নিবিড় আরাধনা, সমকালীন যুগচিন্তা ও যুগমনিসের স্বরূপ সন্ধানে যেমন নিত্য ব্যস্ত ছিল তেমনি ভবিষ্যৎ মুক্তির নিবিড় মন্ত্রণাও ছিল তাঁর কর্মে ও জীবন ধর্মে এবং কাব্য-সৃষ্টির বাণী-বাঙ্ময়ে।

ঃ নির্দেশিকা ঃ

১। The "Independence Day" Pledge—Modern Review, January, 1940. Page—5

২। Ibid

৩। ভারত সরকার ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার মুখপত্র নিউএজ, ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

৪। "The Gathering Storm"—The Second world war. Winston S. Churchill, Volume one. Page—294.

৫। গান্ধী রচনাসম্ভার (ষষ্ঠ খণ্ড) প্রথম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ফেব্রোয়ারী ১৯৭০। সম্পাদনা ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ—৪৪০

৬। ঐ ঐ পৃঃ—৪৪১

৭। সম্পাদকীয়—দেশ। ৬ই জুলাই, ১৯৪০। ৭ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যা।

৮। 'ত্রপুরী হইতে রামগড়'—শ্রীসঞ্জয়। (আনন্দবাজার হতে পুনর্মুদ্রিত দেশ—৭ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা। ১৩৪৬ সাল।

৯। দেশ—৭ম বর্ষ ১৩৪৭।

১০। 'গান্ধী রচনা সম্ভার' (ষষ্ঠ খণ্ড) প্রথম শতবার্ষিকী সংস্করণ। পৃঃ—৪৫৬

১১। সম্পাদকীয়—দেশ। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সাল।

১২। সম্পাদকীয়—অরণি। ২য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা।

১৩। সম্পাদকীয়—অরণি। ২য় বর্ষ, ৩১শসংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ দেশ। ৭ম বর্ষ, ২১শ সংখ্যা।

১৪। 'মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা'—সম্পাদকীয়—অরণি।
৩য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা। ১৯৪৩।

১৫। সাপ্তাহিক সংবাদ—দেশ। ৭ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা ১৩৪৭।

১৬। সাপ্তাহিক সংবাদ—দেশ। ৭ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা। ১৩৪৭।

১৭। সম্পাদকীয়—দেশ। ৭ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা। ১৩৪৭।

১৮। "কমিউনিষ্ট পার্টি কোথায় দাঁড়াইয়া?"—পি সি জোশী।
অরণি—২য় বর্ষ, ১৯৪২। পৃঃ—২৫২ (ঘ)।

১৯। ঐ ঐ —পৃঃ—২৬২।

২০। সাময়িক প্রসঙ্গ—দেশ। ১০ম বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা।

২১। অরণি—২য় বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা। ১৯৪৩।

২২। নিখিলবঙ্গ ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের সভাপতি তারা-শংকরের মতে সমাজে একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক লোক আছে। তাদের সম্পর্কেই তিনি 'তারা' এই উক্তি করেছেন।—'শিল্পীর দায়িত্ব'—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। অরণি—২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা। ১৯৪৩।

২৩। ঐ ঐ পৃঃ—৯৭।

২৪। "ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস"।—
অরণি ২য় ৪বর্ষ, ৯শ সংখ্যা। ১৯৪৩।

প্রবাসী, একসাথে, পরিচয়, লণ্ডন টাইম্‌স, লণ্ডন ইকনমিষ্ট, টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া, ষ্ট্যাট্‌সম্যান, আনন্দবাজার ক্যালকাটা গেজেট, গেজেট অব ইণ্ডিয়া ইত্যাদি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার ও সাহায্য নিয়েছি।

সুকান্ত-কাব্যে সমাজচেতনা

[আমি লিখি তাদেব জন্য যাবা চলেছে ধাবমান জনবাহিনীর সামনেব সাবিতে, আমি লিখি তাদের জন্য যারা পরিচালনা করছে বিরাট আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যে সংগ্রামের সাফল্য রচনা করবে এক সীমান্তহীন শ্রেণীহীন মানবজাতির নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা]

রমাঁ রলাঁ

সুকান্ত কবি, জীবন সংগ্রামে অক্লান্ত কর্মী, সমাজ সচেতন জীবনদ্রষ্টা মূলতঃ মনন চেতনায় সাম্যবাদী স্বাধীনতা, প্রগতি সাম্য ও শান্তির মূলমন্ত্রে দীক্ষিত কবি সুকান্ত সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে একনিষ্ঠ ব্রতী। তার কাব্য চিন্তায় সমাজ চেতনার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি মেলে। কবির জীবন দীর্ঘ নয়,—কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জীবনে ও ছিল অভিজ্ঞতাপূর্ণ এবং খুবই সম্ভাবনাময়। কিন্তু এই সম্ভাবনা ময় জীবনে, যৌবনের কর্মপ্রেরণার সুরুতেই দেখি মৃত্যুর হাতছানি। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জীবন কর্মে ও ধ্যানে তবু দেখা যায় তাঁর অশেষ স্বীকৃতি।

কবি দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালীন পৃথিবীর বাস্তবকে এবং অতি রূঢ় মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছেন সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অপরদিকে সেই মহাযুদ্ধের পরিণাম স্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা; শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-পীড়ণ, অত্যাচার ও যন্ত্রনা-বিধ্বস্ত বাংলার পটভূমি ছিল কবির চিন্তার জগৎ, কর্মের প্রেরণা ও কাব্যের পরিবেশ। তাই এই অশান্ত সমাজ-পরিবেশে কবির জীবনে ও মননে শান্তি ছিল না। জাতির মর্মমূলে রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার যে গ্লানি দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান ছিল সে গ্লানির বিষাদই কবির জীবনে ও মননে মুক্তির শপথ-বাণী উচ্চারণ করে। পরাধীন জাতির জীবন যেখানে শৃংখলিত, পদদলিত, সমাজে যারা দরিদ্র, নিঃস্ব ও সর্বহারা যাদের অভিশপ্ত জীবন নিরানন্দ অন্ধকারে ক্রীতদাসের মত কাটে, যারা নিরক্ষর জগৎ ও সংসার সম্পর্কে অজ্ঞান সমাজে সে সমস্ত, নিগৃহীত, শোষিত ও অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীন মংগল ভিন্ন দেশ ও জাতির জীবনে শান্তি আসা যে সম্ভব নয় সে সত্য কবির হৃদয় অনুভূতির মুক্তভাবনায় সহজেই ধরা পড়ে। কাজে সেই অসহায় সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও তাঁদের নির্বাক মনের ভাষাকে সোচ্চার করার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছেন। কবি তাই ব্যক্তিগত জীবনে সুখ বা আরামের আশায় বৃথা কাল হরণ করেন নি এমন কি নিজের জীবনে সংসার সুখের তৃপ্তিসুধাও খুঁজে বেড়াননি। সমাজে সর্বহারাদের জীবনযন্ত্রণার মর্ম-বেদনাকে হৃদয় উত্তাপের প্রতিটি ধারায় এবং ধমনীর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় অতি সহজেই অনুভব করেছেন তাই সেই ছন্নছাড়া ও নিরন্ন সর্বহারা সাধারণ মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ কামনাই কবির অন্তরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের একমাত্র সাধনা হয়ে উঠেছিল। তাই কবির বিশ্রাম ছিলনা জীবনে,—আর তাঁর এই পরিমিত জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সমাজের এই যন্ত্রনা কাতর সাধারণ মানুষ ও সর্বহারাদের মুক্তিযজ্ঞে। তাই সুকান্তের জীবন মানব-সভ্যতার

ইতিহাসে এক চরম বিস্ময়। জীবন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি এক বিবেক চরিত্র। তাঁর ক্ষনিক আবির্ভাবেই সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ দৃশ্যপট যোজিত হল—তাতে চিত্রিত হল ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়া সমাজের সাধারণ মানুষের কথা, রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে এক নতুন যুগ নিশানা এবং সমাজ জীবনে এক নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিতবার্তা।

কবি সাম্যবাদী,—সাম্যের জয়গানে কবিপ্রাণ মুখর। কর্মেও ছিল তাঁর প্রেরণা প্রবল। দুর্বল দেহে অসীম তাঁর মনোবল। কবির চিন্তা ও ধ্যানে সমসাময়িক সমাজ-চেতনার পরিপূর্ণ আভাস মেলে। তাঁর মনটি ছিল যেমন অতি কোমল ও স্পর্শকাতর তেমনই হৃদয় ছিল গভীর সহানুভূতিতে ভরা ; তাছাড়া কবি হিসাবে তাঁর পরিপূর্ণ আবেগও ছিল বর্তমান। জীবন, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রেম ও মৃত্যু সম্পর্কে বাস্তব মনন চেতনা কবির জীবন-দৃষ্টিতে এক নতুন আলোর সংকেত বয়ে আনে। কবির স্পর্শ কাতর মনে এবং আবেগপূর্ণ হৃদয়ের কাছে তার কোনটিই অবহেলার বস্তু ছিল না।

ব্যক্তির চিন্তা বস্তুকে ঘিরে। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কবির কাব্যচিন্তায় তাই সমাজ চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ থাকাই সম্ভব। কেননা চিররুগ্ন সুকান্তের প্রাণ ও মনটি ছিল কিন্তু খুবই সতেজ ও জীবন্ত এবং বাস্তব অনুভূতি প্রবণ।

"জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ"

আগামী : ছাড়পত্র।

তাই কবি এই সমাজ জীবনের ভাবী রূপান্তরের আগমনী সংকেতবার্তা শোনাচ্ছেন জাতির কানে কানে।

"যদি ও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপন মর্মর ধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা। .

আগামী : ছাড়পত্র।

জীবনের শেষ বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত কবির মনে বড় এক আশা ছিল,—বড় এক বাসনা ছিল, এক নতুন সমাজ ও এক নতুন পৃথিবী দেখার। কবির সে আশা পূরণ হয়নি তাঁর এই জীবনের স্বল্প সীমার মধ্যে। কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি.—ভোলেন নি এই সমাজ ও জীবনের পূর্ণ মূল্যায়নে এবং তাঁর

বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ পরিণতির সম্ভাবনাকে। এই দেশ ও তার জল, মাটি, আকাশ কবির জীবনে খুবই আকর্ষণের ছিল। কবি প্রকৃতি ও মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ অতিযত্নে নিরীক্ষণ করেছেন, লক্ষ্য করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের রাজ্যের নানা বৈষম্য সূত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি, মনে মনে উপায় চিন্তা করেছেন এই বৈষম্যকে দূর করা যায় কি করে ; প্রশ্ন তুলেছেন সমাজে এই বৈষম্য কেন ?

"বলতে পার বড়োমানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
… … …
বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?"

পুরনো ধাঁধা : মিঠেকড়া।

শৈশব জীবন সাধনায় কবি যেখানে সমাজ জীবনের এই বৈষম্যসূত্রেরসন্ধান পেতে আগ্রহী হন, পরবর্তীকালে অতি সচেতন ভাবেই সমাজ জীবনের বিবেক চৈতন্যকে তিনি নাড়া দেবার চেষ্টা করেন। ধনের অসম-বণ্টন ব্যবস্থার কবলে পড়ে বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ যুগের পর ধরে যুগে যুগে জীবনে বাঁচার তাগিদে দিন রাত অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে। অথচ এই পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাবে তাঁদের জীবন সমস্যা-জর্জর। অভাবের তাড়নায় দিনের পর দিন কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তারা সময় গোনে। অথচ ধনিক মালিক-শ্রেণী অপর দিকে দিনের পর দিন মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। সমাজের বুকে শোষণের এ পরিণামের শেষ হবে কবে, জাতির এই যুগ সন্ধিক্ষণে কবির জীবনে তাই-ই এক মহাজিজ্ঞাসা। তাই জীবন ধারণের এই মহাগ্লানির সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণে মুক্তি পিপাসু কবি দেখতে পান সমাজ জীবনে এই ধন বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া। তাই কবির আক্ষেপ ভরা কণ্ঠে শুনি :

"মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে
পেটে খেটে হল হন্যে,
ধন-দৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে
দেখ, একজন মজুর কে দেখ
ধুকে ধুকে দিন কাটছে
কেনা গোলামের মতই খাটুনি
……তাই হাড়-ভাঙা খাটছে।

পৃথিবীর দিকে তাকাও : মিঠেকড়া।

কিন্তু তবু বাঁচার মত পারিশ্রমিক নেই। জন্ম থেকেই দুঃসহ জীবন যন্ত্রনার অসহ্য বিষাদ ও গ্লানি বহন করে চলতে হয় প্রতিনিয়ত। তাইতো কবি আক্ষেপ ভরা কণ্ঠে বলে উঠেন।

তবুও ভাড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি করেই কাটে কাল।"

পৃথিবীর দিকে তাকাও : মিঠে কড়া।

এই চিত্র তো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজ-জীবনের এ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বাস্তবতাকে কবি তাঁর হৃদয়-অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। পুঁজিবাদী এই সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থের অসমবণ্টনের ফলে যে ধনবৈষম্যের বিরাট প্রাচীর গড়ে ওঠেছে, সে প্রাচীরের ভিত কবে এই মাটির বুকে ধ্বসে পড়বে কবির জীবন-জিজ্ঞাসায় সেই ভাবনারই আভাস মেলে। দেশ ও জাতির বুকে এই শোষণ ও বঞ্চনা কবির জীবনে গভীর বেদনা জাগিয়ে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তাঁর সম-সাময়িক অন্যকোন কবির কাব্যে সমাজ-জীবনের এই তীক্ষ্ণ রূপভেদের মৌলিক কোন কারণের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁদের চিন্তা রাজ্যের উচ্ছ্বাস দেখা গেলেও তার সুষ্ঠু পরিণতির বিকাশ দেখা যায় না। এমনকি ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী অনেক কবির কাব্যেও সঠিক সমাজ-সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায় সেদিক থেকে সমসাময়িক—এমন কি সাম্প্রতিক কালেও কবিকুলের মধ্যে একক ও অনন্য। এই পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এ দেশের সমাজ কাঠামোয় কবি লক্ষ্য করেছেন একাধারে ছোট বড় মাঝারী জোতদার, মজুতদার, পুজিপতি মালিক ও জমিদার শ্রেণী ও তাদের পোষমানা তোষামোদকারীদল তাছাড়া বিদেশী শাসক শ্রেণীর খয়ের-খাঁ ও চাটুকার বৃত্তিজীবি এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী, যাদের কাছে সমষ্টি-স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দেশ ও জাতির জীবনে মুক্তির চেয়েও বিদেশী প্রভুর পোষমানতা ও সন্তুষ্টি-বিধানই জীবনের মহৎ কর্ম বলে বিবেচিত হ'ত। কবি আরও লক্ষ্য করেছেন সেই উল্লিখিত শ্রেণীচরিত্রের চরম নীতিহীনতা ও অমানুষিক আচরণ। যারা যুগ-যুগ ধরে ধর্মের ধোয়া তুলে জাতির জীবনে শোষণ ও বঞ্চনার লাগামহীন অত্যাচার ন্যায্য অধিকার বলে চালিয়ে এসেছে। যাদের এই চিরকালের

অন্যায়ের ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ দিনের পর দিন ক্রমেই দরিদ্রতর হয়ে পড়েছে। সমাজজীবনের এই নগ্নবাস্তব চিত্র কবি সুকান্তের জীবন দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। তাই এই শোষণ ও বঞ্চনা রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির পথ ধরে যে ভাবে সমাজ জীবনে তীব্র সংক্রামিত হয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে চেপে ধরেছে তার কি কোন মুক্তির উপায় নেই কবির মনন-চেতনায় সেই প্রশ্নই ধরা পড়ে। কিন্তু কবির মনে এ সম্পর্কে কোন সংশয় নেই, তিনি নিশ্চিত, তাঁর বিশ্বাস ও প্রবল—মানুষের এই সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার শেষ একদিন হবেই, ধর্মীয় গোঁড়ামিরও একদিন অবসান হবে, মানুষ তার ন্যায্য প্রাপ্যটুকু অর্জন করবে, ভোগ করবে বিষয় ও সম্পদের সমান অধিকার এবং যথার্থ মানবধর্মে ফিরে পাবে বাঁচার অধিকার। তাছাড়া জীবন ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতাও ফিরে পাবে। কবির জীবনে ও মনে এ শুধু নিছক কল্পনা মাত্র নয়,—কিংবা উচ্ছ্বাস বা আবেগের স্বপ্ন নয়,--এ তাঁর জীবনাদর্শের বাস্তব প্রেরণা। তাই বুঝি কবি জীবন দৃষ্টিতে দেখতে পান :

> "পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে
> লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
> ... ...
> যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।"

লেনিন : ছাড়পত্র।

কেননা কবি তো এই সত্যকে জেনেছেন বাস্তবে ঘটা ইতিহাসের শিক্ষা থেকে।

> লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
> অন্যায়ের মুখোমুখী লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
> আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
> হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
> মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
> বিদ্যুৎ ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
> ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,
> বিপর্যস্ত, ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
> —আসে শত্রুজয়ের সংবাদ

লেনিন : ছাড়পত্র।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাম্যবাদের মুক্ত শিবির রাশিয়া তখন দেশ ও জাতির প্রগতির পথে অতি সচেতন প্রয়াসী। সাম্যবাদের এই প্রগতিকে

চরম ফ্যাসিবাদী হিটলার কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারে না। তাই ১৯৩৯ সালে মধ্য ভাগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করে বসেন। এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের গতি কিছুদিনের মধ্যেই এক নতুন অঙ্ক যোজনা করে। গড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী রাষ্ট্র রাশিয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকায় মিত্রশক্তি। সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটেন এবং আমেরিকাও এই মিত্র শক্তির শরিক হলেন। তাছাড়া যুদ্ধ শেষে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অধীন পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা করেও সেই সমস্ত পরাধীন দেশের জনসাধারণকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। লালফৌজ তখন জার্মানীর সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। ফ্যাসিষ্ট বর্বতার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে রাশিয়ার যুবকগণ তখন লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। নিজের জীবনের চেয়েও দেশ ও জাতির স্বাধীনতা বড়—কেননা দেশের স্বাধীনতাই ব্যক্তি স্বাধীনতার পবিত্র দায়িত্ব বহন করে। রাশিয়ার মানুষ স্বাধী-নতার পবিত্র ঐতিহ্যকে পুরো উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার বলিষ্ঠ প্রেরণা নিয়ে ফ্যাসিষ্ট বর্বর দস্যুর আক্রমণের মুখে পুরো আস্থা নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কবি লক্ষ্য করলেন লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত অসংখ্য লেনিনের প্রতিজ্ঞা-কঠোর জীবন স্বীকৃতি। ইতিহাসের সেই শিক্ষা গ্রহণ করেই কবি স্বৈরাচারী চরম দেখেছিলেন জার সম্রাটের পতন এবং রাশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাছাড়া লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর অন্যান্য মুক্তিকামী দেশগুলির জীবন সংগ্রাম। এই ইতিহাসের কথা যে তিনি কেবল জানেন তা নয়; এই ইতিহাসের দীক্ষাও তাঁর অন্তরে মূলমন্ত্র রূপে ছিল। এবং সেই সমস্ত মুক্তিকামী দেশগুলির জীবন সংগ্রামের প্রবল উত্তাপ ও তার হৃদয়ে প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে মুক্ত ছিল। তাইতো কবির আসল পরিচয় ছড়িয়ে আছে মুক্তিকামী দেশগুলির সংগ্রামী দেশগুলির জনতার সাথে:

"ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে
আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে

ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।"

ঠিকানা : ছাড়পত্র।

কবির জীবনে মুক্তি চেতনা সারা বিশ্বের সংগ্রামী চেতনার সামিল হয়েছে। সাড়া বিশ্বে দেশ ও জাতির শোষণ মুক্তির সংগ্রাম কবিপ্রাণ উৎসর্গ-কৃত। তাই মুক্তির পথ ধরে জীবন সংগ্রামের ব্রতই কবির জীবনে একমাত্র লক্ষ্য। তাই কবির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে :

জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
"দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে, রক্তের অক্ষরে।"

ঠিকানা : ছাড়পত্র

কবির স্বদেশ আজ বিপন্ন। যুদ্ধের দামামা আজ সীমান্তের দ্বারে। দারিদ্র ও লাঞ্ছনার অসহ যন্ত্রনা আজ সাধারণ মানুষের জীবনে। যুদ্ধ তাই জীবনের চরম শত্রু। সে শত্রুর নিত্য আনাগোনা ও আবির্ভাবের সমূহ সম্ভাবনায় দেশ ও জাতির জীবন আতঙ্কগ্রস্ত।

কবির মনে তবু আশা—তাঁর এই জীবন-যন্ত্রনা কাতর বুভুক্ষু দেশ,-যে দেশ মৃত্যুর দিন গোনে :

"এ দেশ বিপন্ন আজ : গ্লানি আজ নিরন্ন জীবন
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী ; নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আলপনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর ;"

শত্রু এক : ছাড়পত্র।

অথচ যার ক্ষুব্ধ আত্মা মুক্তির স্বপ্ন দেখে। সে দেশে একদিন পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত হবে। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বৈষম্যের কবল থেকে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ,—গড়ে উঠবে এক নতুন জগৎ, জন্ম নেবে নতুন শিশু যার কোন হারাবার ভয় থাকবে না। কবি যেন তাঁর জীবন অনুভূতিতে সেই নতুন শিশুর পদধ্বনি শুনতে পান :

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস স্তূপ পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের।" ছাড়পত্র : ছাড়পত্র।

কবির এই জীবন দৃষ্টি বাস্তব অনুভূতিপ্রবন মনন চেতনায় অভিব্যক্তি। কবি মানুষের জীবনে শোষণ ও বঞ্চনার নিত্য আনাগোনা লক্ষ্য করেছেন। তার মূল অনুসন্ধান করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে,—বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গির অনুভূতিতে।

কবি কালের যাত্রী। কালের ইতিহাস তাঁর চিন্তার ফসল। যুদ্ধ মহামারী, বিপ্লব-বিদ্রোহ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, দমন-পীড়ণ-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি সমাজ-জীবনের এই নিত্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কবি চিন্তার প্রধান উপকরণ ছিল— আর এই বিষয় চেতনাগুলিই কবির মর্মলিপি হয়ে কবিতায় আত্মপ্রকাশ হয়েছে। কবির কাব্যে এই সমাজ চিন্তা যে ভাবে আশ্রয় নিয়েছে তার মূল্যায়নই বর্তমানে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কবির জীবন কাল এক বিদ্রোহের কাল। জন্মেই কবি দেখেছেন দেশ ও জাতির জীবনে এক পরাধীন সত্তার নগ্ন ভয়ালরূপ। হাহাকার বঞ্চনা ও শোষণের এক মহাকারাগার। অথচ প্রতিকারের চেষ্টা বা পরিকল্পনা নেই,—প্রতিবাদের অধিকার নেই,—জীবনধারণে কেবল নির্যাতনের গ্লানি,—পরাধীনতার বিধস্ততা। তাইতো কবির ক্ষুব্ধ কণ্ঠ ধ্বনিতে মুখর :

"এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী ! সেলাম তোমাকে সেলাম।"

অনুভব : ছাড়পত্র।

দেশ জুড়ে তখন আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। শ্লোগান মুখর পথ-ঘাট-মাঠ-প্রান্তর ধ্বনিতে সোচ্চার-ইংরাজ দেশ ছাড় ! প্রসঙ্গতই দেড়শ বছরের ইতিহাসের গোড়ার কথা মনে পড়ে। দেশীয় পুঁজিবাদীগোষ্ঠীর একাংশের চরম বিশ্বাস-ঘাতকতার সুযোগ নিয়ে কৌশলে ইংরাজদের দেশের দেওয়ানী কর্তৃত্ব লাভের দুর্দমনীয় স্পৃহাই ইতিহাসের পাতার গোড়ার কথা ও সাক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর একাংশের সেই চরম বিশ্বাস ঘাতকতার সুযোগেই ইংরাজ-বনিক-গোষ্ঠি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক শোষণের পূর্ণকর্তৃত্ব লাভ করলো। সুতরাং দীর্ঘ প্রায় দেড়শ' বছর ধরে ইংরাজ বনিক গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের যে অবাধ নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেলেন সে অধিকার কেবল মুখের দাবীর কাছে ছেড়ে যান কি করে ! কেবল মুখের দাবীর কাছে, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী তার মাথা নত করে না—তার রাজ ক্ষমতা ত্যাগ করে না,— তার শোষণের অধিকারকে ছেড়ে দেয় না। কবি এ সত্যকে ইতিহাসের পাতা

থেকে গ্রহণ করেছেন,—দেখেছেন সিপাহী বিদ্রোহের পরিণাম,—বিদ্রোহ দমনের নামে কি পাশবিক জিঘাংসাবৃত্তি, সাওতাল বিদ্রোহ দমনের নামে কি পাশবিক জিঘাংসাবৃত্তি, সাওতাল বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণতি।

হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়,—অবাধ শোষণ পীড়ন-অত্যাচার প্রতিকার ও প্রতিরোধের মানসিকতা সৃষ্টি করে। বিশ শতকের গোড়া থেকেই ইংরাজ শাসক-গোষ্ঠীর অন্যায় শাসন ও শোষণ নীতির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। কবি যেন তাই মানুষের অন্তরে সেই বিদ্রোহের সজীব সত্তা অনুভব করেছেন :

> "বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
>
> প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
> দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;"

অনুভব : ছাড়পত্র।

মানুষের জীবনে বিক্ষোভের সজীব-সত্তাই বিদ্রোহের পতাকা বহন করে নিয়ে আসে। কবি সাধারণ মানুষের মনে সেই বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। জনমনে এই পুঞ্জিভূত বিক্ষোভই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পতাকা-চিহ্নরূপে চিহ্নিত হতে থাকে। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের নীতির প্রতি কবির প্রথম জীবনে যত না আস্থা ছিল তার চেয়ে প্রবল আকর্ষণ ছিল বামপন্থী আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রতি। ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শের প্রতি কবির গভীর নিষ্ঠা দেখা যায়। কবি কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট রূপে গড়ে তোলেন। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে গড়ে উঠতে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন কবির সুকান্তের সে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান ছিল। তিনিই ছিলেন তৎকালীন যুগে কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তিকামী সংগ্রামী অংশের একজন সাধারণ কর্মীরূপে কবি তাঁর পারিপার্শিক অবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন,—বুঝতে পারেন শোষণের মূল উৎসের কারণগুলি কোথায় তাছাড়া সমাজের বুকে মূল উৎসগুলি কি। বাস্তব সচেতন কবি বুঝতে পারেন শোষণের ক্ষেত্রে দেশী বা বিদেশী শোষকের কোন ভিন্নরূপ নেই। তাই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে ঘরে ও বাইরে সর্বত্রই শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে,—সেই শোষক শ্রেণীর চরিত্র একই মাপ কাঠিতে চিহ্নিত। শোষণ ও বঞ্চনাই হ'ল তাদের ধর্ম। কবির জীবন-দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সেই শোষক শ্রেণীর ধর্ম-ই ধরা পড়ে :

"বণিকের চোখে আজ কী দুরন্ত লোভ ঝরে পড়ে;
মুহুর্মুহু রক্তপাতে স্বধর্ম-সূচনা;"

মৃত্যুঞ্জয়ী গান : ছাড়পত্র।

তাই দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কবির জীবনে মূল লক্ষ্য নয়। অর্থনৈতিক স্বাধনতাই তাই কাম্য। পুঁজিবাদী শাসনতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় অর্থনৈতিক শোষণের বনিয়াদ দৃঢ় করার তাগিদে। তাই সর্বহারা-শ্রেণীর মুক্তি অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজে। কবি সেই সমাজ জীবনের স্বপ্নে বিভোর। যে সমাজ ব্যবস্থায় কবি আশা করেন।

"আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে।"

এতো সমাজতন্ত্রের মূল কথা--শ্রেণীহীন সমাজ জীবনের কথা—শোষণ ও বঞ্চনাহীন আর্থসাম্যের কথা। কিন্তু কবির জীবনের এ স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধারণে ছিল বিরাট বাঁধা। কেননা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজ চিত্রের রূপ তখনও ভিন্ন। কবির জীবন-দৃষ্টিতে সে বাস্তব রূপ ধরা পড়ে :

"অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ
অনৈক্যের চোরাবালি; পরস্পর অযথা সন্দেহ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভৎর্সনা কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ"

লেনিন : ছাড়পত্র।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনের অসম বন্টনবিধির ফলে যে সমস্ত সামাজিক ত্রুটিগুলি সমাজ জীবনকে অনবরত আঘাত দিতে থাকে ভারতবর্ষের আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তার ব্যতিক্রম ছিল না। পরস্পর দ্বেষ হিংসা, লোভ-সন্দেহ, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা লাভের অদম্য স্পৃহা এবং মুনাফা লাভের উদগ্র বাসনা সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন প্রবল রূপ ধারণ করেছে। স্মরণ আছে যে, ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, ২২শে জানুয়ারী ফিলিপ ফ্রান্সিস একটি মিনিটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব পেশ করেন ১৭৯৩ খঃ অব্দে তারই পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ দেশের জনজীবনে যে নতুন আর্থনীতিক প্রভাব গড়ে ওঠে তাতে সমষ্টিচেতনা বোধের পরিবর্তে ব্যষ্টি চেতনাই প্রধান হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাই চিন্তার আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে দেশীয় জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোর পুঁজিপাতি ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর চরিত্রের সঙ্গে বিদেশী পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উক্ত শ্রেণীর চরিত্রের কোন পার্থক্য নেই। এ যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফসল,—এ তথ্য সুকান্তের জীবনে পরম সত্যরূপে ধরা দিল। তাই এই সর্বনাশা লোভ সম্পর্কে কবি কণ্ঠে প্রতিবাদমুখর বলিষ্ঠ ঘোষণা শুনি :

"লোভের মাথায় পদাঘাত হানো
আনো রক্তের ভাগীরথী আনো।"

বোধন ; ছাড়পত্র।

কেননা এই ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত লোভ ও মুনাফার সীমা-পরিসীমা থাকেনা,—এমন কি মানবিক চেতনাবোধের সুষ্ঠু বিকাশ ও সম্ভব হয় ওঠে না,—অতিরিক্ত সঞ্চয় ও সীমাহীন ভোগের স্পৃহা মানুষকে করে তোলে বর্বর ও পশুর চেয়েও দুশ্চর পাশবিক। কবির জীবন দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়ে :

"......লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্ন বস্ত্র,"

বোধন : ছাড়পত্র।

কেননা এই ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ গায়ের রক্ত ঘামে ঝরিয়ে যে পরিশ্রম করে চলে তারই পারিশ্রমিক চুরি করে দেশের মজুত-দার, মুনাফাখোর মালিকগোষ্ঠী মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। আর এই শোষণের বলি হয় দেশের অসহায় মানুষ—যাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই,—যারা স্বভাব দুর্বল ও ভীতু, যাদের এই প্রতিবিধানের পথ জানা নেই। সাধারণ মানুষ তার পারিশ্রমিকের ন্যায্যপ্রাপ্যের অভাবে অনাহারে, বিনা-চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কবির ক্ষুব্ধআত্মা প্রচণ্ড রোষে প্রতিবাদ তোলে। কবি কণ্ঠে তাই কৈফিয়ৎ শুনি :

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার?"

বোধন : ছাড়পত্র।

মালিক আর মজুতদারের নিয়ত আক্রমনের ফলে কত নিঃস্ব দুর্বলপ্রাণ বলি হয়। তার হিসাব বোধ হয় তাদেরও জানা থাকে না। ভোগের স্পৃহায় তাদের

দৃষ্টি জাল আচ্ছন্ন। বিবেক বুদ্ধি ও মানবিকতা নিষ্ঠুর পীড়ন ও অত্যাচারের উন্মাদনায় দিশাহারা। তাই পশুত্ব এসে থাবা বিস্তার করে মনুষ্যত্বের দরবারে। অপ্রস্তুত মনুষ্যশক্তি পশুশক্তির কবলে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। সমাজ-জীবনের এই দুঃখে কবিজীবন তাই ক্ষত-বিক্ষত।

তাছাড়া মালিক, জোতদার এবং মজুতদার প্রভৃতি সমাজের শোষকশ্রেণীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি ও কবির জীবন-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কবি দেখতে পান শোষক শ্রেণীর নগ্ন পাশবিক রূপ :

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙ্গেছিস ঘর বাড়ি……"

বোধন : ছাড়পত্র।

মালিক ও মজুতদারের বাড়তি মুনাফা সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র তেমনি বাড়তি ভোগের সহজতৃপ্তির যৌন-লালসা ও প্রবল। তাই ভোগ ও লালসার পরিতৃপ্তিতে অসহায়ের সংসারেও আগুন জ্বালাতে তাদের মনে কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। স্বভাব সুন্দর জীবন ও নির্মল শান্তির সহজ আনন্দতৃপ্তিতে তাদের মনের তৃষ্ণা মেটে না,—তাই পাশবিক প্রবৃত্তিতেই মনের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—তাতে শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন কখনও সজাগ হতে দেখা যায় না। অর্থ ও ভোগের প্রাচুর্যই মানসিক বিকৃতির পথকে সজাগ করে তোলে। কবি সুকান্ত সমাজ জীবনে এই বিচ্যুতির জন্য মর্মান্তিক পীড়িত। মানবিক বোধ বিবর্জিত বিবেকশূন্য নীতিহীনতার জন্য কবি-হৃদয় যেমন উৎপীড়িত তেমনি তার প্রতি বিধান ও মীমাংসার জন্যও কবি হৃদয় উৎকণ্ঠিত। তাই কবির হৃদয় উচ্চ-কণ্ঠে প্রতিহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ হতে শুনি :

"আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই।
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন রে মজুতদার,
ফসলে ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।"

বোধন : ছাড়পত্র।

কিন্তু কবি জানেন সমাজের বুকে এই অন্যায় শোষণ ও পীড়ন বন্ধ করতে হলে যে দৃঢ় মানসিকতা এবং বলিষ্ঠ আদর্শবোধের প্রয়োজন সেই মনন চেতনা ও আদর্শ

বোধ সমাজের অধিকাংশ শোষিত জনের মধ্যেই ছিল না। অসহায় দুর্ব্বল মানুষ জীবনের এই বিপর্যয়কে ভাগ্যের পরিহাস ভেবে বিমূঢ় হয়ে থাকে,—মুক্তির কোন পরিকল্পনার কথা তারা চিন্তা করে না—অন্যায়ের প্রতিবিধানের কোন পথ তাদের জানা নেই। গতানুগতিক দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়েই গা-সহা জীবন যাত্রা তাদের। প্রচলিত জীবনযাত্রায় থাকতেই তারা অভ্যস্ত—নতুনের চিন্তা বা পুরাতনকে ভাঙার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায় উদাসীন। কবির জীবন দৃষ্টিতে সেই যুগ স্বভাবই ধরা পড়ে ঃ

("ছুটি আজ চাই ছুটি,
চাই আমাদের সকালে বিকালে দুটি
নুন—ভাত, নয় আধ পোড়া কিছু রুটি।)"

তরঙ্গ-ভঙ্গ ঃ পূর্বাভাস।

সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষেব মনে এই চেতনার উপলব্ধিতে সমাজ-জীবনের মুল মেরুদণ্ডেব ভঙ্গুরত্বকেই মেনে চলার আভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এই ক্লান্তি এবং দেহে ও মনে গ্লানি দূব করতে সক্ষম না হলে এই সমাজের মুক্তি ও নতুনজীবনের উপস্থিত সম্ভব নয়। মানুষ যে গতিশীল—তার জীবনের এই গতিবেগের আলোড়নেই সমাজজীবনেব এই পঙ্গুত্বের গ্লানি দূর করা সম্ভব হবে। তাই তো কবির মনে জিজ্ঞাস্য ঃ—

"—একি অবসাদ ক্লান্তি নেমেছে বুকে,
তাই তো শক্তি হারিয়েছি আজ
দাঁড়াতে পারি না রুখে।
বন্ধু, আমরা হারায়েছি বুঝি প্রাণ-ধারণের শক্তি,
তাই তো নিষ্ঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
এর চেয়ে ভাল মনে হয় আজ পুরনো দিন,
আমাদের ভালো পুরনো, চাই না নয়া নবীন।"

তরঙ্গ-ভঙ্গ ঃ পূর্বাভাস।

সমাজের বুকে সাধারণ মানুষের মনে জীবন সম্পর্কে এই উদাসীনতাই শোষন ও পীড়নকে শক্তিশালী করে তোলে। শোষিতের মনে দুর্বলতাও ভীরুতাই তাদের মুক্তির পথে প্রধান বাঁধা। তারা দুঃখভোগের জীবন যন্ত্রণাকে অদৃষ্টের নির্বন্ধ বলে মেনে চলে। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে সত্যসন্ধানে এরা ব্যর্থ হয়। তাই শত্রুর আসল পরিচয় তাদের জানা নেই। ধর্মভীরু মানব-আত্মা তাই ক্ষমার দীক্ষা

গ্রহণ করে। আর শেষ পর্যন্ত এই অক্ষম ভীরুতাই শাসক ও শোষকের মিলিত শক্তির নিষ্ঠুর অন্যায়ের প্রতি ক্ষমার আদর্শই বড় হয়ে দেখা দেয়। মানুষের জীবনে এই চরম অন্যায়ের প্রতি ক্ষমার ধর্মকে কবি কখনো মেনে নিতে পারেন না। তাই তো সমাজের বুকে এই মনোভাব লক্ষ্য করে কবি বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলেন :

"………তবু আজও বিস্ময় আমার
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।"

বোধন : ছাড়পত্র।

তাই সমাজের বুকে প্রচলিত শোষণ-বঞ্চনা, পীড়ন ও অত্যাচারের নাগপাশ এবং জীবন ও যৌবনের সর্বনাশ হতে মুক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রয়োজন।— যে সংগ্রামে ভীরুতা ও অন্যায়ের প্রতি ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। তাই সাধারণের জীবনে ও মননে বলিষ্ঠ সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। কবি তাই জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান :

"আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি।"

বোধন : ছাড়পত্র।

শাসক ও শোষক শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থে এক প্রচ্ছন্ন ঐক্য গড়ে তোলে। তাদের স্বার্থকে রক্ষার জন্য তাদেরই ভাড়াটে করা অস্ত্রবাহী লোক রয়েছে। যদিও একথা স্বীকার্য যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থের প্রলোভনে ভুলিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই এই শক্তি শাসক ও শোষক শ্রেণী সংগ্রহ করে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর নিজেদের সেই অস্ত্রবাহী লোক নেই। তাদের একতাই বল। তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে বড় শক্তি আর কিছুই হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন, মানসিক শক্তির দৃঢ়তা। তাই শোষিত সমাজের কাছে কবির বলিষ্ঠ আবেদন :

"টুকরো টুকরো করো ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

বোধন : ছাড়পত্র।

সর্বহারা শ্রেণীর মিলিত সংহতি ভিন্ন সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীশত্রুর সুখের নিদ্রা

ভাঙতে এবং শোষকের মসনদটলতে পারে না। তাই শাসক ও শোষকের মিলিত নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মিলিত সংহতি একান্তই প্রয়োজন। তবেই সর্বহারা শ্রেণীর মিলিত শক্তির কাছে শাসক ও শোষক শ্রেণী শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য:

কবি মার্কসীয়-তত্ত্বে বিশ্বাসী। দীর্ঘকালের শোষণ ও বঞ্চনার ফলে মানুষ আজ কিংকর্তব্য বিমূঢ়। সাধারণ মানুষ আজ হতাশাগ্রস্ত। জীবনে মুক্তির স্বপ্নরয়েছে কিন্তু সেই বাঞ্ছিত মুক্তির জন্য যে সাহস ও শক্তিরপ্রয়োজন সেই শক্তি ও সাহস যেন দীর্ঘ জীবন-অবক্ষয়ের মাঝে বিলীন হতে চলেছে। কবি তাই আজ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছেন এই অসহায় উদ্দমহীন জনতার জীবনে ও মনে তাই শক্তির প্রয়োজন। আগামী দিনের শোষনমুক্ত নতুন পৃথিবী ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাছাড়া কবির জীবন-সাধনায় যে—এসেছে নতুন শিশু'— কবির সেই নবজাতকের উপযুক্ত আবাসভূমি গড়ে তোলার জন্য মহান আত্ম-ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাই তো কবি নতুন পৃথিবীর সভ্যতার আলোতে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সেই নতুন শিশুর আবির্ভাবকে সার্থক করে তুলতে কবির জীবনে কোন গ্লানিই নেই।

"তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম, —এই আমার জীবনের সান্ত্বনা।......"

২৪শে পৌষ ১৩৪৮: বন্ধু অরুণকে লেখা পত্রাংশ।

কবির এই জীবনচেতনাবোধ বিশ্বমানবতাবোধের প্রতীক। কিন্তু কবি জানেন এই আহ্বানে সাড়া দেবে কয়জন। কারণ সমষ্টির স্বার্থসাধনায় সমাজ জীবনের কল্যাণ কামনায় আত্মত্যাগের উপাসনা করা জীবনের এক বিরাট সাধনা। যে নবজাতক শিশু কালের পৃষ্ঠে পা ফেলার জন্য উৎসুক সে তো জানে না এ সমাজ ও পরিবেশ কত জঘন্য, তার আবহাওয়া কত বিষাক্ত,—সুস্থভাবে জীবনধারণে এবং শান্তিতে বসবাসের কত অনুপযোগী। যে সমাজে মানুষের মত বাঁচার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই, সেখানে বাঁচার যথার্থ সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। মানুষের জন্ম ও জীবন সৃষ্টির ইতিহাসে সে তো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। সৃষ্টির প্রেরণাতেই জীবন ও জন্মের রহস্য বর্তমান। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তার জন্ম থেকেই চায় সুন্দর হয়ে বাঁচতে কিন্তু সে সুন্দর জীবন যাত্রার বাঁধাও অনেক তাই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। মানুষের জীবনের সার্থকতা সমাজে তার জীবনে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠার মধ্যে চিহ্নিত থাকে।

আর এই সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য অমননীয়সংগ্রামের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তির প্রসারতার প্রবনতা থাকা আবশ্যক। কবি সুকান্তর সমাজ জীবনে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছেন। তাই কবি তাঁর জীবন সাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেছেন :

'চলে যাব আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণ-পণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নব জাতকের কাছে আমার এ দৃঢ় অঙ্গীকার।

ছাড়পত্র : ছাড়পত্র

কবির চোখে এই নবজাতক আর কেউ নয়—সে যে তাঁরই মানস সন্তান; সমাজের নবরূপায়ণ এক সাম্যবাদী সমাজ জীবনের স্বাধীন উত্থান-রূপ।

বৃটিশশাসন কবলিত ভারতের আধাসামন্ত তান্ত্রিক ও আধা ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক শোষণের চিহ্ন বর্তমান। কবি তাঁর বাস্তব জীবন-দৃষ্টিতে এই শোষণের নগ্নরূপ লক্ষ্য করেছেন। একদিকে পুঞ্জিভূত ধন সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার অপর দিকে মুষ্টিমেয়ের জীবনে নিজের স্বার্থসিদ্ধি বজায় রাখার মূল্যায়নে সমাজের বৃহৎ অংশের জীবন হাহাকার ও মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণার পরিণতি। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়ে ওঠে। অথচ সভ্যতার ইতিহাসে সেই সাধারণ মানুষের জীবনের কোন মূল্যই সূচীত হয় না। সমাজের বুকে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মহিমাই তাতে স্বীকৃত হতে থাকে। অথচ তারা বুঝে না সাধারণের শ্রম চুরিকরা মূল্য তাদের বিষয়-সম্পদ-অট্টালিকা ও সভ্যতার প্রাচীর অতীত ও বর্তমানের পটভূমিতে গড়ে ওঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর চিত্র কবির হৃদয়ে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবির সমাজ বিশ্লেষনী দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়ে :

"এ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, আর চোখের জলের।"

চারাগাছ : ছাড়পত্র।

কত মানুষের শোষণের মধ্য দিয়ে, কত মানুষের পরিশ্রমের দানে, কত রক্ত-জল করা ঘামের বিনিময়ে, কত চোখের জলের ইতিহাসের অন্তরালে এই প্রাসাদের সৌদমহিমা গড়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ আজও যুগ যুগ ধরে এই শোষণ ও বঞ্চনার জীবন-যন্ত্রণার ইতিহাস স্মরণ ও মূল কারণ অনুসন্ধান করার

প্রয়োজন বোধ করেন নি। সমাজ-জীবনে জীবন সচেতনতার অভাব বোধই এ ধরণের মানসিকতার মূলে দায়ী। সমসাময়িক সমাজ জীবনে এ ধরণের নির্লিপ্ত চেতনা বোধ কবির জীবন-জিজ্ঞাসায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবি আশাবাদী। ইতিমধ্যেই সমাজে শোষণ-বঞ্চনা ও রাজনৈতিক পীড়নের অভীষ্ট আক্রমণে সমাজের একাংশের জন-মনে তখন বিক্ষোভের ঝড় বইতে শুরু করে। যদিও একথা সত্য যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তখন প্রায় দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরেই সজাগ হয়ে উঠেছিল তথাপি একথা বলতে বাধা নেই যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য চাই জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা. সে প্রশ্নে সাধারণ মানুষের চেতনা তত স্বচ্ছ ও উন্নতছিলনা কেন না সে সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে দেশের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একাংশের ভূমিকাও ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারলেই দেশের মানুষের মুক্তি হবে, জীবনে শান্তি আসবে। এই চিন্তাধারা যে সঠিক নয় আজ তা দেশের মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম।

কবি অতি বাস্তব সচেতন জীবন-দ্রষ্টা। বস্তুবাদে বিশ্বাসী কবির জীবন দৃষ্টিতে দেশের পরাধীনতার গ্লানি যেমন কঠোর হয়ে ওঠে তেমনি সাধারণের জীবন শোষণ ও বঞ্চনার যন্ত্রণাও কবি-হৃদয়ে গভীর বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। তবু এই শোষিত সমাজ জীবনের মধ্যেই কবি প্রত্যক্ষ করেন এক শুভ ইঙ্গিতের।

> "এমনি পৃথিবী
> আমার চোখের আর মনের পর্দায়
> আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।"

চারাগাছ : ছাড়পত্র।

পূর্বেই বলেছি, সমাজের একাংশের মনে তখন ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন লক্ষ্য। তাদের আন্দোলনের পথও ভিন্ন। তাদের আন্দোলনের রূপরেখা গড়ে ওঠে সমাজ-জীবনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের আসন্ন অনুষ্ঠানের তাগিদে। কবি বিপ্লবে বিশ্বাসী। যে বিপ্লব শোষিত সমাজের ভিত্তিকে চুরমার করে ভেঙে দিয়ে এক শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তুলবে। তার জন্য চাই বিক্ষোভিত জনমনের অন্তরে বিদ্রোহের বীজমন্ত্র বোনা। কবির স্থির বিশ্বাস সাধারণ জনমনে এই বিদ্রোহের তরঙ্গ সূচনা ঘটবেই। কবির চোখে সে আসন্ন দিনের রূপরেখা বিদ্রোহের বীজ মন্ত্রে ধরা দিল:

"তাই তো অবাক আমি, দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ বিদীর্ণ করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।"

চারাগাছ : ছাড়পত্র।

কবির শৈশবজীবন ছিল খুবই আবেগ প্রবণ। তাঁর এই গভীর আবেগ প্রবণতাই কল্পনা যত সুদূর-প্রসারী করে তোলেছে। তাই কবি কল্পনা যত সুদূর-প্রসারী বাস্তবতার বাস্তবে তার প্রতিফলণ ততই জটিল। কেননা একথা ভুললে চলবে না যে সমাজ জীবন এই শোষন ও বঞ্চনার মূল অনুসন্ধানে কয় জন সমাজ সচেতন ছিলেন! সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল বৃটিশ সরকারকে হটাতে পারলেই দেশ স্বাধীন হবে। দেশ স্বাধীন হলেই যে মানুষের জীবনে সব সময় স্বাধীনতা আসে না এ সত্যকে উপলব্ধি করার মত বাস্তব সমাজ সচেতনতা সাধারণ মানুষের জীবনে ছিল না। তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ সাতাশ বছর পরও সমাজ জীবনে ধনের অসম-বণ্টন ব্যবস্থা এবং আর্থনীতিক বৈষম্য আজও বর্তমান, যার ফলে গরীব আরো গরীবে পরিণত হচ্ছে এবং ধনী পুঁজিপতি গোষ্ঠী আরও ধনও সম্পদের অধিকারী হচ্ছে। কিন্তু কবি যে নতুন পৃথিবীর কথা বলেছেন সে নতুন পৃথিবীতে শোষণ মুক্ত সমাজের কথাই জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। কবি কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়।

"আমরা চেয়েছি স্বদেশ ভুমি।"

বিক্ষোভ : ঘুম নেই।

কিন্তু কবির চোখে এই স্বাধীন স্বদেশভূমির এক স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। কবির জীবন দৃষ্টিতে সেই স্বাধীন স্বদেশভূমি শোষণ-মুক্ত সমাজের উজ্জ্বল আলোকে ভাস্বর। কিন্তু কবি তাঁর জীবনানুভূতিতে উপলব্ধি করছেন, সেই স্বাধীন মুক্ত সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাতী শক্তি। কবির দৃষ্টি পথে সে সত্য ধরা পড়ে :

"শংকাকুল শিল্পীপ্রাণ, শংকাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।
হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
... ...
বিদেশী চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদবৃন্তে"

ছুরি : ঘুমনেই।

বিশ্বাসঘাতকতা, জঘন্য দালালিবৃত্তি ও চাটুকারবৃত্তি-ই হল যাদের পেশা ও নেশা,— এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি কবির প্রচণ্ড ঘৃণা। কবি তাই বৃটিশ সরকারের পোষমানাকে বার বার ধিক্কার দিয়েছেন—অনুরোধ করেছেন দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদের বশ্যতাকে অস্বীকার করতে:

"তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।"

১লা মে-র কবিতা: ১৯৭৬: ঘুমনেই।

সমাজসচেতন সুকান্তের চোখে সমাজের শক্তিহীনতাই ধরা পড়েছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় দেশের মানুষ ন্যায়-নীতি ও অধিকার-বোধ সম্পর্কে বড়ই উদাসীন হয়ে পড়েছিল। সমাজের মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকার মধ্যেই জীবনের পরিণতি অনুভব করেছিল। সুস্থ জীবন বোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ উপলব্ধি ছিল না। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণতঃ রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে সুন্দর ও সুস্থভাবে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, আর থাকতে ও পারেনা। সমস্যার পীড়নে সাধারণ মানুষের জীবন অতীষ্ট হতে থাকে তাই সমাজজীবনে সুস্থ চিন্তার ও বিকাশের এবং সুস্থ পরিকল্পনার অবসর কোথায়। সাধারণ মানুষের জীবন তাই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। কবির স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টিতে তাই এ সত্যই ধরা পড়েছে। তাই তো কবির

"কি হবে কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়?
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়?"

১লা মে-র কবিতা ১৯৪৬: ঘুমনেই।

যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন শান্তি নেই, সুখ নেই, যে জীবন ধারণে মুক্তি নেই কেবলই আতঙ্ক আর জীবন-যন্ত্রণা সে জীবন ধারণের কোন মর্যাদা নেই জীবনে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। জীবন

তো কেবল ধুকে ধুকে মরার জন্য জন্ম নেয়নি,—জন্ম হয়েছে সুন্দর হয়ে বিকাশের জন্য। তাই তো জীবন সুন্দরের প্রতীক। কবি তাঁর সমাজে সুন্দরের অপমৃত্যু লক্ষ্য করেছেন। আর তার ফলে জীবনযন্ত্রণার জ্বালা অনুভব করেছেন। সমাজের এই বিমূঢ় ও অস্বস্তিকর পরিণতির ভাব লক্ষ্য করে কবি অনুভব করেছেন, যেন ক্লান্তি এসে সমাজকে ঘিরে ধরেছে,—সমাজ যেন তাঁর ভাঙা পা ফেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। কবি লক্ষ্য করেছেন সমাজ যেন তার অভিশপ্ত জীবন মেনে নিয়ে আপন অন্তরে অসহনীয় দুঃখ যন্ত্রণার জ্বালা ভোগের সংযম আরতি করে চলেছে। কবি সেই বিমূঢ় জনতার উদ্দেশ্য কঠিন প্রশ্ন তুলে বলেছেন:

"ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুকে চলবে কতদিন?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাস—প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে কাঁপতে থাকবে কতকাল?
মাথায় মৃদু চাপড় আর পেটের ক্ষুধা আর গলার শিকলকে?
কতক্ষণ নাড়বে লেজ?"

পয়লা মে-র কবিতা ১৯৪৬: ঘুমনেই।

কবি সমাজের বুকে একদিকে দুর্বল, অসহায় সাধারণ মানুষ অপরদিকে তোষামোদপ্রিয় ও পোষামানা দালালশ্রেণী সম্পর্কে এক উদাত্ত গম্ভীর আওয়াজ তুলেছেন। তিনি সত্যকে জেনেছেন জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে। সর্বহারা শ্রেণী-শত্রু শোষণ প্রিয় শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন আপোস চলতে পারেনা। কবি এ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ইতিহাসের পাতা থেকে। কোন ক্ষেত্রেই শোষণের পূর্ণ মুক্তিতে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা চলতে পারে না। কবির স্থির বিশ্বাস, মর্যাদাহীন জীবন ধারণে কোন মূল্যই সূচীত হয় না। জীবনে মুক্তি ও স্বাধীনতা ভিন্ন জীবনের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। আর জীবে সেই মুক্তি আসতে পারে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই কবি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ১লা মে-র শপথ বানী পালন সম্পর্কে বলেছেন:

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত হতে দিগন্তে।"

পয়লা মে-র কবিতা ১৯৪৬: ঘুমনেই।

কবি জানেন, শাসক শ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের শপথ মন্ত্রকে

শোষন মুক্তির মূলমন্ত্র রূপে মনে করে। তাই মে-দিবসের ডাকে শাসকও শোষক শ্রেণী কখনো প্রসন্ন থাকতে পারে না। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে তারজন্য বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হতে চলে না। তাই তাদের কণ্ঠে বিদ্রোহের গান শোনা যায়ঃ

"রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়ায়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ রাঙানিকে করিনা গণ্য
ধারি না ধার।
... ...
সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ নাড়া,
ছড়াবো ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান॥"

বিদ্রোহের গান : ঘুমনেই।

মে দিবসের মূল মন্ত্র কবির অজানা নয়। শাসকশ্রেণীর অন্যায় শাসন ও শোষণ সম্পর্কে কবির জীবন দেবতা ক্ষুব্ধ। শাসক শ্রেণী শুধু অন্যায়ভাবে শাসনই করে না অনবরত শোষণ করে নেয় শোষিত জনতার রক্ত। তিলে তিলে এই রক্তক্ষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ এর প্রতিকারের শপথ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত তারা লক্ষ্য-হারা। শাসক ও শোষক শ্রেণীর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারে তাদের চিন্তা আচ্ছন্ন। সমাজ বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে প্রতি বিপ্লবের সূচনা করে—তা করে শাসক শ্রেণী তার নিজের স্বার্থে—। সাধারণ মানুষ তাতে বিভ্রান্ত হয়ে মুছড়িয়ে পড়ে। মনে দ্বিধাও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কবি দেখেছেন সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়িত সমাজ জীবনের ভগ্নরূপকে। কবি তাই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন:

"মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।" পরিখা : ঘুমনেই।

ভীরুও কাপুরুষতা অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক দুর্বলতাকে আশ্রয় করেই বেড়ে ওঠে। মানসিক এই দুর্বলতার অবসরেই প্রবলের নিক্ষেপিত মৃত্যুবান এসে প্রাণকে গ্রাস করে। তাই অযাচিত এই অপমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির জন্য সাধারণের জীবনে মানসিক দৃঢ়তাই কবির কাম্য।

পৃথিবীর সব দেশেই শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের অ্যাগুয়া বাহিনী। তাদের সেই মিলিতশক্তি ও সক্রিয় আন্দোলনকে ভাঙার জন্য

মালিকগোষ্ঠী ও শাসকশ্রেণীর সাহায্যে তাদের পোষমানা দালাল ও ঠেঙারে বাহিনী গড়ে তোলে, যাদের একমাত্র প্রধান কাজ হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য আন্দোলন ও ধর্মঘট ভাঙার কাজে লিপ্ত থাকেন। উপরন্তু সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্র করে হীন স্বার্থ চরিতার্থতার লোভে। এরা তাদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দেয় অর্থের বিনিময়ে। বিবেককে কবর দেয় স্বার্থের আড়ালে। কবি এই বিবেকহীন ও মনুষ্যত্ব বর্জিত স্বার্থান্ধ দালাল শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছেন :

"জাহান্নামে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত
বেরিয়ে এসো—"

মজুরদের ঝড় : ছাড় পত্র।

সর্বহারা শ্রেণীর জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ে এবং মুক্তির সংগ্রামে শ্রেণী সচেতন মানুষ কোন কালেই দালাল-শ্রেণীর এই বিশ্বাস ঘাতকতাকে ক্ষমা করে না। ক্ষমা করে না নিশাচরের মত তাদের জঘণ্য ষড়যন্ত্রকে – যে ষড়যন্ত্র ন্যায্য পাওনা ও অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সময় সময় পরাজয় ঘটায় তাছাড়া এরা হীন ষড়যন্ত্রে রহস্য জাল সৃষ্টি করে সময় সময় বৃথা রক্তপাতও ঘটায়। কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন কালের ইতিহাস থেকে। তাই কবির এই বলিষ্ঠ ঘোষণা।

সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সমাজের শত্রু এই দালাল শ্রেণীর জন্ম আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, এই দালাল শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যুগে যুগে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবেই। এই দালাল-দের পেছনে শক্তি যোগায় শোষক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ হাতিয়ার গুণ্ডার দল এবং শাসক শ্রেণীর পরোক্ষ বল পুলিশী ক্ষমতা। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দালাল দল সাময়িক জয়ী হয়,—জয়ী হয় শ্রমিক —শ্রেণীর বাস্তব চেতনা ও শক্তিহীনতা, শিক্ষার যোগ্যতা ও মানসিক দৃঢ়তার অভাবের ফলে। কবি তাই লক্ষ্য করেছেন :

"অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।"

মজুরদের ঝড় : ছাড়পত্র।

কিন্তু কবি জানেন, এ জয় তাদের সাময়িক। তাদের এই সাময়িক জয়ই

চূড়ান্ত পরিণাম নয়। এই ধর্মঘট ভাঙা দালালদের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও উপেক্ষা জানিয়ে কবি কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

"এতটুকু লজ্জা হয়না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে ধর্মঘট বে-আব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।"

মজুরদের ঝড় : ঘুমনেই।

কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র মানুষ চিরকাল সহ্য করে না,—ভুলেনা তাদের জীবনের পথে বাধা কারা,—ভুল করে না তাদের শ্রেণী শত্রুদের চিনতে। মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে তাদের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন যন্ত্রনার ও দুঃখ ভোগের কার্য্যকারণ সম্পর্কে ধীরে ধীরে সত্য উপলব্ধি করতে পারে,—জীবন সমস্যা সম্পর্কে এই সত্য চেতণা-বোধই মানুষকে তার শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ করে। জন জীবনে কবি যেন চেতনা বোধের স্ফূরণ লক্ষ্য করেছেন। সেই মনন চেতনার পূর্বভাসই কবি দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে ও মননে অনুসরণ করার প্রয়াসী হয়েছে। কবির স্থির বিশ্বাস, সারা বিশ্বে এই শ্রমজীবী মানুষের উত্থান শুরু হবে,—শোষনের বিরুদ্ধে মরণ পণ সংগ্রাম সংগঠিত হবে, সুস্থ জীবন ও যৌবনের চিরশত্রু শোষক শ্রেণীর উপর বয়ে আসবে কাল বৈশাখী ঝড়। যে ঝড় সমাজের বুকে জঞ্জালদের এক কথাল শত্রুদের একে একে টেনে তুলবে নিক্ষেপ করবে আস্তাকুঁড়ে। তাই কবি সেই ধর্মঘট ভাঙা দালালদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন :

"ঝড় আসছে সেই ঝড়
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।"

মজুরদের ঝড় : ছাড় পত্র।

কবি সেই আশু ঝড়ের সংকেতে জীবন সংগ্রামের পূর্বাভাস লক্ষ্যকরেছেন আর সে সংগ্রাম তো শ্রমিক শ্রেণীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে শোষক-শ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-গোষ্ঠীর মুখোমুখী সম্পন্ন হবে। তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

"আর হুঁশিয়ার মজুর
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখী।"

মজুরদের ঝড় : ছাড় পত্র।

রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক শোষণের পথ ধরে শাসন ও শোষক শ্রেণী যে

ভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে তার বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি কালের ইতিহাসের পাঠ থেকে। শোষণের কায়েমী স্বার্থকে দৃঢ় করার তাগিদে শাসক গোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থনে শোষক-শ্রেনী জনজীবনে যে বিপর্যয় ডেকে আনে তাতে কালে কালে সমাজের বুকে ধ্বংসের নানা সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা সংকট মুহূর্তে দাঙ্গা মহামারী গৃহযুদ্ধে সমাজের বুকে অগ্রগতির কালো যবনিকা নেমে আসে। জীবনের এই বৃথা রক্তপাতে কোন মূল্যই সূচিত হয় না। সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রাম তাতে সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়, সাময়িকভাবে পথরোধ হয়ে দাঁড়ায় সমাজ জীবনের অগ্রগতি। কবি এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন বাস্তব সমাজ চিত্রের পটভূমিতে প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন কবি, তাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই বৃথা রক্তপাত সম্পূর্ণ বিফলে যেতে পারে না। তাই কবির কণ্ঠ আজ প্রতিজ্ঞা কঠোর :

> "বৃথা রক্তের শোধ নেবো দুনো
> এক পা পিছিয়ে দু'পা এগোনোর
> আমরা করেছি পণ,"

একুশে নভেম্বর ১৯৪৬ : ঘুমনেই।

প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞামন্ত্র উচ্চারণ করতে বসে কবি মহান বিপ্লবী লেনিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। তবে একথা সত্য যে আন্দোলনের এই কৌশলগত দিক সম্পর্কে পূর্ণসচেতনতা সমাজের সীমিত অংশের মধ্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু কবি তাঁর আদর্শবোধের ধর্ম অনুযায়ী আন্দোলনের এই কৌশলগত পদ্ধতির যৌক্তিকতাকে মেনে নিয়েছিলেন।

কবি স্বদেশপ্রেমিক। তার চেয়েও কবি মানবপ্রেমিক। তাছাড়া কবি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বাদে বিশ্বাসী। তাই মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা, মানষের প্রতি শোষন-পীড়ন অত্যাচার সমস্তই কবি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে; বেদনায় কবিহৃদয় কাতর হয়ে ওঠে। কবি লক্ষ্য করছেন সমাজে, মানুষের জীবনে মর্মন্তুদ হাহাকার; দাম্পত্য জীবনে সহজ মিলনে বাঁধা; জীবনে বাঁচার তাগিদে জীবীকার কঠোর নিয়ন্ত্রণে হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলির বন্দীদশা। কেননা কর্তব্য পালনের কঠিন দায়িত্ব রয়েছে সাধারনের জীবনে

সমাজে মানুষের জীবনে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব রয়েছে ঠিক কিন্তু সেই কর্তব্য সাধনের উপযুক্ত মর্যাদা কোথায়! যে সমাজে জীবনে নিরাপত্তার অভাব,—পারিশ্রমিকের মূল্য হয় চুরি সে সমাজ ব্যবস্থায় সাধারনের জীবনে সুখ বা শান্তি কোথায়! কিন্তু এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণের জীবনে তার রুটিন মাফিক কোন কর্তব্য কর্মের গাফিলতি সহ্য করে না। নিয়ন্তা মণ্ডলী তার শারীরিক অসুবিধা বা বিপর্যয়ের কথা শুনতে রাজি নয় অথচ পারিশ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্যদানের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রকাশেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে ন। এ হেন সমাজ কাঠামোয় সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি বা নিরাপত্তার আভাস কোথায়। তাই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভবনাহীন জীবনের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে 'রাণার' কবিতায় 'রাণার'-র জীবনেব মর্মবেদনার মধ্যে

"ক্লান্তি শ্বাস ছুয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্পদামে।

রানার : ছাড়পত্র।

তাই তো সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অবসর বিনোদনের সুযোগ নেই দাম্পত্য জীবনে সহজ মিলনে সুখ বা শান্তি নেই কেবল-ই অভাব; আর কর্তব্যের তাড়নায় জীবন যন্ত্রণা-কাতর। তাই কবির সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি মর্মবেদনায় রাণার পরিবারের মর্মবেদনা ধরা পড়ে:

"অনেক দুঃখে বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।"

রাণার : ছাড়পাত্র।

শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক চরিত্ররূপে 'রাণার' চরিত্র কবির জীবন-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সাধারণ মানুষ তার সংসারে অভাবের তাড়নায় স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়ের এই স্বাভাবিক সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে একান্তই জোর করে হৃদয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে,—ভুলে থাকতে বাধ্য হয় মানুষ তার জীবনের আমোদ-আহ্লাদকে। সাধারণ মানুষের জীবনে অভাবের তাড়নায় চির বিষণ্ণতা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়—কাল রাত্রির ঘনান্ধকার যেন দৃষ্টিতলে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই কবির দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের জীবন ও মননের ছবি ধরা পড়ে:

ঘরেতে অভাব পৃথিবীটাই মনে হয় কালো ধোঁয়া।"

রাণার : ছাড়পত্র।

মানব দরদী কবি সমাজ জীবনে এই সমস্যার প্রতিকারের রূপরেখা মনে মনে

পরিকল্পনা করেন। তাই সমাজজীবনে সাধারণ মানুষের অন্তরের স্বভাব-দুর্বল ভীরুতার যেন অবসান হয়,—দুর্জয় শক্তি এসে জন-মনের কাপুরুষতাকে দূর করে দেয় এই আশাই কবির অন্তরে আলোড়িত হতে থাকে। এই সমাজ-সংসার ও মানবজীবন সম্পর্কে সচেতন কবির কণ্ঠে তাই বুঝি প্রার্থনা শুনি:

"আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি।"

বোধন : ছাড়পত্র।

যুগ যুগ ধরে মানুষ যেন শক্তির আরাধনা করে চলেছে। মানুষ স্বভাব-দুর্বল এবং এই দুর্বলতার অবসরেই শোষকশ্রেণী তার বিষ-বাষ্প নিক্ষেপ করে মানুষের জীবন প্রবাহের মধ্যে,—অল্পে অল্পে এই বিষ গ্রাস করে মানুষের শক্তিকে জীবন ধারণের উদ্যম ও স্পৃহাকে। মানুষ ধীরে ধীরে আপন চেতনার অন্তরালেই জীবনী শক্তিকে হারাতে বসে। দেহে ও মনে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। শাসক ও শোষক শ্রেণী সে সুযোগেই আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে তোলে। কিন্তু মানুষ দেহে ও মনে দুর্বল হলেও শেষ পর্যন্ত আপন জীবনীশক্তি ও রক্ত ক্ষয়ের কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কবি সুকান্ত তাঁর সমসাময়িক সমাজে জনজীবনে সেই চেতনাবোধের ক্ষীণ আভাস যে লক্ষ্য করেছেন। তাই কবি শাসক ও শোষক শ্রেণীর মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জনতার মিলিত শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তা না হয় জীবনের মূল্য কোথায়! তাই সমস্ত ভয় ভাবনা ভুলে জনতাকে অত্যাচারীর অন্যায় পীড়ন ও শোষণের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা মন্ত্র উচ্চারণে কবি সুকান্ত উদাত্ত কণ্ঠে বলেন:

"প্রশ্ন নয়কো পারা না পারার,
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারায়
দ্বার ভাঙ্গা আজ পণ;

জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুবাণী : ঘুমনেই।

তাছাড়া হীন ও ঘৃণ্য জীবন লাভে জীবনের মুক্তি নেই। কেননা মানুষের জীবনে—

"মুক্তিও দুর্লভ ও দুর্মূল্য।"

ঐতিহাসিক : ছাড়পত্র

তাই তো কবির কণ্ঠে শুনি জীবনদেবতার প্রতি দৃপ্ত ঘোষণা:

"মাথার উপরে ভয়ঙ্কর

বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর ;
তা, যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।"

বোধন : ছাড়পত্র।

মানুষের জীবনে ভয়ঙ্কর বিপদ ও সর্বনাশা ঝড়ই শেষ পর্যন্ত জনমনের ভয়-ভাবনা ও শঙ্কাকে কাটাতে সাহায্য করে। জাতির জীবনে এই ভয়-শঙ্কা-ত্রাসের অবসান না ঘটলে জীবনে মুক্তি ঘটা সম্ভব নয়। জীবনকে সত্য-সুন্দর ও মুক্ত করে তুলতে যৌবনে ত্যাগের ব্রত পালনের শপথ বাণী উচ্চারণ একান্তই আবশ্যক। সুতরাং জীবনে শক্তি সাধনা ছাড়া মুক্তি আনা অসম্ভব। সেই মুক্তির জন্য জীবনকে অনেক মূল্য দিতে হয়। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও চরিত্রিক দৃঢ়তার একাগ্র প্রেরণা প্রয়োজন। যৌবনের ধর্মই হল—জীবনকে বিলিয়ে সৃষ্টি সত্যকে রক্ষার তাগিদে এবং সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মানসে আত্মনিমগ্ন হওয়া। তাই যৌবন অন্যায়, অত্যাচার ও পীড়নকে সহ্য করে না, ভয় বিপদ-ত্রাসকে গ্রাহ্য করে না,—মুক্তির জন্য পাগল হয়ে ওঠে দুর্দমনী শক্তিতে। সেই যৌবন যদি নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে বুঝতে হবে, জাতির জীবনে সে যৌবন অভিশাপ বহনকরে নিয়ে আসে ; সে যৌবন হয় বিকৃতি. কু-রুচি পূর্ণ ; তার আবির্ভাবে দেশ ও জাতির জীবনে অন্যায় পীড়নের বন্যা বহনে সাহায্য করে। একদিকে কবি জাতির জীবনে যৌবনের শৈথল্যকে লক্ষ্য করেছেন,—অপরদিকে সেই যৌবনেরই বিকৃতরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই কবি জাতির জীবনে যৌবনের এই শৌথিল্য, বিমূঢ়তা এবং নিষ্ক্রিয়তাকে দূর করতে মাথার উপর ভয়ঙ্কর বিপদ নামাকে সাদরে আহ্বান করেছেন,—নতুবা জাতির জীবন ও যৌবন বিকৃত যৌবনের হাত থেকে মুক্তি সাধন সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টির অন্তরালে যে পাশবিক জিঘাংসা বৃত্তি লুকিয়ে আছে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ দেখা দেয় দেশ ও জাতির জীবনে যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ আর এ সমস্ত বিপর্যয়ের বলি হয় দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে তাই নেমে অকাল মৃত্যুর হাতছানি। সে সময় সাধারণ মানুষের জীবনেও

"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

ঐকতান : রবীন্দ্রনাথ

কেননা জীবন যেখানে আতঙ্ক গ্রস্ত, ভয় ও সন্ত্রাসে প্রাণ মন অহরহ সঙ্কুচিত

তা ছাড়া যেখানে নিয়ত চোখের সামনে মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি প্রাণ-মনকে জীবন্ত দগ্ধ করতে থাকে। সেখানে 'শান্তির ললিত বাণী' জীবনে ব্যর্থ পরিহাস সৃষ্টি ছাড়া মুক্তির শপথ বাক্য উচ্চারণে সাধ্য কোথায়!

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শান্তি বহন করে না, এ যে শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও স্বার্থ-দ্বন্দ্ব এ সত্য সর্ব সাধারণের সহজ বোধগম্য নয়। আর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে। যুদ্ধ যে অনেক সময় শাসক গোষ্ঠীর সমস্যামুক্তির অপকৌশলমাত্র আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে একে একে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নানা জীবন যন্ত্রণা তারই সত্য স্বরূপ কবির জীবন বীণায় রক্সিত হয়েছে।

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃংখল দুই হাতে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিঃ ছাড়পত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কলকাতা মহানগরীর বুকে বোমারু বিমানের সর্বনাশা আক্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কবি স্বয়ং। শুনেছেন অহরহ সাইরেণের আর্তনাদ, দেখেছেন ভয়কাতর অসহায় মানুষের জীবনে ছটফটানি, প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনের অহেতুক অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মর্মন্তুদ পরিণতি। কবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে কলকাতায় ছিলেন, প্রত্যক্ষজীবন অভিজ্ঞতায় যুদ্ধের পরিণাম উপলব্ধি করেছেন। ১৩৫০-র দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে তিনি স্বেচ্ছা-সেবকের কাজে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছেন জীবন যন্ত্রনাকাতর নিরন্ন ও রোগাক্রান্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে কবি আর্ত-মানুষের সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। এ সমস্ত আর্ত মানুষের সেবায় কবির জীবন-দেবতা ও বুঝি দিশাহারা। কবির হৃদয় ছিল গভীর অনুভূতি প্রবণ। তাই অযথা এই নিষ্ঠুর রক্তপাতে ও প্রাণের অপমৃত্যুতে কবির জীবনে যেন শিহরণ জাগে। তবু দেশের সাধারণ মানুষ যেন নির্বাক ও নিস্পন্দ অথচ তাদের দু'হাতে বন্ধন শৃংখল কিন্তু মানুষের জীবনে সেই বন্ধন মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোথায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এই মানসিক নিষ্ক্রিয়তায় কবিহৃদয় বিস্ময় বিমুঢ়!

সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রতিকূল পরিবেশ কবির জীবনে ও মননে বিষাদের সুর বেজে ওঠে। কবি আশাবাদী। কবি দেখতে পান, বুদ্ধিজীবী সমাজ এই চক্রান্তের মূল অনুসন্ধানে অসমর্থ নন। কিন্তু তাদের একাংশ দেশ ও জাতির সামগ্রিক স্বার্থের চেয়েও ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় বলে মনে করেন। অপরদিকে বুদ্ধিজীবী সমাজের অপরাংশ এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত হতে চান। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের সক্রিয় প্রস্তুতিতে এবং তাদের অদম্য স্পৃহা ও প্রচারের উজ্জল দীপ্তিতে দেশের সাধারণ মানুষের মনেও এক উদ্দীপনা দেখা দেয় দেশোদ্ধারের স্বপ্নে। যে দানবীয় শক্তির প্রকোপে পড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত সে জনজীবনের প্রাণে ও মনে তাই এক উন্মাদনা জাগে, কি করে আজ স্বাধীন মুক্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। কবি যেন জনজীবনের সেই মর্মবাণী শুনেছেন :

> "তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
> দানবের সাথে আজ সংগ্রাম তরে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি : ছাড়পত্র।

পূর্বেই বলেছি কবি আশাবাদী। কবির স্পর্শকাতর মনেও তাই গভীর প্রেরণা। কবির মনন চিন্তায় স্বাধীন মুক্ত এক নতুন সমাজের স্বপ্ন বিরাজ করে চলে। তাই কবির হৃদয়ে বুঝি গুপ্ত মন্ত্রণা চলে :

> "আমার হৃদযন্ত্রে ঘা লেগে বেজে ওঠেছে কয়েকটি কথা
> পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।"

খবর : ছাড়পত্র।

কবির এ স্বপ্ন নিছক কল্পনা মাত্র নয়। ইতিমধ্যে বিশ্বের মুক্তিকামী দেশগুলি অর্থনৈতিক শোষণ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কবি তাই তাঁর মনন দৃষ্টিতে পৃথিবীর সংগ্রামী জনতার জয় ও সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির স্থির বিশ্বাস এই জনগণই দেশ ও জাতির শক্তির মূল উৎস। সুতরাং তাদের এই সংগ্রাম বিফলে যেতে পারে না—জয় তাদের অনিবার্য।

কবির বিশ্বাস, এই স্বপ্ন সার্থক হতে পারে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। কবি ইতিমধ্যেই অহিংস আন্দোলনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীর শোষণ মুক্তির আন্দোলন সে তো অহিংস আন্দোলনে সম্ভব নয়। কবি

বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী নন,—বিপ্লববাদে বিশ্বাসী। কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শের প্রতি কবির তাই গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। শাসক তার শেষ ক্ষমতা প্রয়োগ ভিন্ন স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে না। তাই অহিংস আন্দোলন বা শান্তির ললিত বাণীতে মুক্তির আশা কম। যদিও বা তাতে পরিবর্তন আসে কিন্তু তাতে মুক্তি আসে না। তাতে শোষণের ইতিহাসে পালা বদল হয় বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে দিন বদলের পালা বা মুক্তি আসে না। মুক্তির জন্য চাই সংগ্রাম—সশস্ত্র সংগ্রাম, যে সংগ্রাম রক্তের বিনিময়ে নতুন সম্ভাবনা ময় জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। কবি তাই সাধারণ মানুষের জীবনের শত্রু শাসক-শ্রেণীর মোকা-বিলায় সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। কবির জীবন বীণায় সেই মহা-মারণের মন্ত্র উচ্চারণ—হতে শুনি :

"অস্ত্র ধরেছি এখন সম্মুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;"

প্রস্তুত : ছাড়পত্র।

এ কথা স্মরণ থাকা ভাল যে, কবির এই মনন চেতনার অভিব্যক্তি জাতীয় জীবনের সামগ্রীক চেতনার পূর্ণ বিকাশ নয়।

কবির জীবন-দৃষ্টিতে বাস্তবের রূঢ় অসংগতি, পীড়ন, অত্যাচার, আর শোষণের নিত্য যন্ত্রণা ধরা পড়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই অমানুষিক আচরণে কবি মন গভীরভাবে আহত। কবির এই আহত হৃদয়ের যন্ত্রণাই ধরা পড়েছে তাঁর কাব্য সাধনার মধ্যে। দেশ জুড়ে যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ কবির হৃদয়কে যে গভীরভাবে আলোড়িত করে তোলে তারই উজ্জ্বল সন্ধান মেলে কবির এক জবানীতে। কবি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন :

"বাংলা দেশের কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানেও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব, অনাহার, পীড়া-পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবল ভাবে উপলব্ধি করেন ? তারা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গত জনের মুখপাত্র ? তাঁদের অমুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত ? এক কথায় তারা কি জনগণের কবি ?"

কথা মুখ : আকাল : সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কবির এই জবানীতে কবি আত্মার মর্মলিপি অনুভব করা চলে। কবি বাস্তব-বাদী। ভাবের রাজ্যে স্বর্গমহিমার রূপ কল্পন। করা সহজ,—অলীক সত্যের আসরে

সুন্দরের উপাসনা করা দুঃসাধ্য নয় কিন্তু রূঢ় বাস্তবের কঠিন সত্যের আধারে সুন্দরের আরতি করা সহজ সাধ্য নয়। তারজন্য চাই কবি প্রাণের বাস্তবানুভূতি ও সত্যপ্রকাশের ক্ষমতা। সত্য সেযতই কঠিন বা রূঢ়ই হোক সে সত্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করার মধ্যে কবি-আত্মার সত্য-স্বরূপের পরিচয় মেলে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, বস্তুকে বাদ দিয়ে ভাবের জন্ম নয়। বস্তুকে আশ্রয় করেই ভাবের বিকাশ ঘটে। কবি সুকান্ত তার সমসাময়িক অগ্রজ ও অনুজ কবি ও শিল্পী সমাজের মনন ও চিন্তার রাজ্যে সেই বস্তু চেতনার অভাব লক্ষ্য করেছেন। তাই তো কবির মনে বিস্ময় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জীবনের দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রনা ও দুর্গতির কথা ক'জন কবির মর্মলিপিতে ধরা পড়েছে! তাই বাস্তবতার আধারে কবি খুঁজে পেতে চান প্রকৃত সত্যকে যে সত্য মানুষ ও প্রকৃতির কাছে অলঙ্ঘনীয়। তাই যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ইত্যাদি সমসাময়িক ঘটনাসমূহ কবির দৃষ্টি এড়াতে পারিনি। কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজে দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ার রূপ। তাই দাঙ্গাবিধস্ত বাংলাদেশে উৎসব আনন্দ কোথায়! কবির জীবনে খণ্ড আনন্দের পূর্ণ স্বীকৃতি নেই। সমাজ জীবন যেখানে আতঙ্কগ্রস্ত, মানুষের জীবন যেখানে অনিশ্চিত সেই অনিশ্চিত ও অশুভ ভাবনার মাঝে আনন্দের প্রকাশ কি সম্ভব। কবি সুকান্তের একটি চিঠিতে সে সত্যের আভাস মেলে :

> "আমার নেইকো সুখ দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব;
> রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
> এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি;
> মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা কাঁদে নোয়াখালি।
> সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা;
> এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা।"

(বন্ধু ভুপেনকে কবিতায় লেখা চিঠি : কবি সুকান্ত : পৃঃ ৭২
অশোক ভট্টাচার্য।

কবির বাস্তব-জীবন দৃষ্টিতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহর ও গ্রাম বাংলার সমাজ-জীবনে অশান্ত জনমনের মর্মলিপি ধরা পড়েছে। তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে বন্ধুকে লেখা এই চিঠীতে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তো সর্বগ্রাসী,—গ্রাস করে মানুষের চির সাধনার চির আকাঙ্খার পরম সত্যবস্তু সুন্দরকে,— গ্রাস করে মানব সভ্যতা ও তাঁর কীর্তিকে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের জীবনে যুদ্ধ অভিশাপ বহন করে

নিয়ে আসে। সৃষ্টি-সত্যে ধ্বংসের যবনিকা টেনে দেয়,—মানুষ সেই সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর মুহূর্তকালের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। সৃষ্টির এই বিনাশ মুহূর্তের জন্য মানুষ কোন কালেই প্রস্তুত থ কে না,—অথচ এই বিনাশ যজ্ঞের সাক্ষীরূপে প্রতিনিয়ত তাঁকে আত্মবিনাশের মুহূর্তকাল গননা করতে হয়। জীবনে বেঁচে থাকার এত বড় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবলে পড়ে উৎপীড়িত ও আতঙ্কিত দেশ ও জাতির মনের অবস্থা কবির একটি চিঠিতে ধরা পড়ে:

> "যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কিছু ঘটেনি, তবুও কলকাতার নাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সব ক'টা লক্ষনই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো প্রত্যক্ষ করেছি।······আর মাঝে মাঝে আসন্ন লোকের ভয়ে ব্যথীত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে নগরীর বুঝি অকল্যান হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে কলকাতা। তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক—এই হ'ল কলকাতার বর্তমান অবস্থা।"

২৪শে পৌষ, ১৩৪৮; সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কবির জীবানুভূতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কলকাতার জনজীবনের একরে রিপোর্ট ধরা পড়েছে। সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসে ও জীবনের আসন্ন মৃত্যুতে কবি হৃদয় বিষন্ন। জীবন রসিক কবির জীবনের প্রতি গভীর করুণা ও সহানুভূতিতে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ালু পরিনতির কথাই ধরা পড়েছে। মানুষের জীবনে আজ মৃত্যু-ভয়, প্রাণে গভীর আতঙ্ক, মনে দুরন্ত বিভীষিকা। অহেতুক মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেবার কোন যৌক্তিকতাই খুঁজে পান না সাধারণ মানুষ। সাইরেণের আর্তনাদ শুনে তাই প্রাণ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেন উর্দ্ধশ্বাসে। যুদ্ধের নিশ্চিত আক্রমণের মুখে এভাবে ছুটোছুটীতে প্রাণের অপমৃত্যু ঠেকানো সম্ভব নয়। বিনাশ ও ধ্বংস যজ্ঞেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। তাই আসন্ন ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর সভ্যতার প্রতি কবির গভীর প্রীতি ও অনুরাগ তাঁর বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে ধরা পড়ে:

> "বড়ো ভালো লেগেছিলো পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি, কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হবো। ··· — — কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে; প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র করেছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।"

অরুণাচল বন্ধুকে লেখা চিঠি : ২৭শে পৌষ : ১৩৪৮ :
সুকান্ত ভট্টাচার্য।

কবি সুকান্ত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণামকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন অনুভব করেছেন তেমনি তিনি অনুভব করেছেন এই যুদ্ধেরও অবসান হবে। সাম্রাজ্যবাদীর লোলুপরসনা একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়বে। জীবনের বলি বন্ধ হবে। দেখা দেবে নতুন প্রভাতের আলো—নতুন জীবন রূপ নেবে নতুন ভাবে। মানব সভ্যতার ধ্বংস ও জীবন বিনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হিংস্র শ্বাপদতুল্য শত্রুদল নতুন জীবনের পদাঘাতে পরাস্ত হবে। আর এই নতুন পৃথিবী ও নতুন সভ্যতার মুক্তিতে তাই জীবনে আত্মত্যাগের কঠিন ব্রত উদযাপন করতে হবে।

"আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়।"

বন্ধুকে লেখা চিঠি ২৪শে পৌষ : ১৩৪৮ : সুকান্ত ভটাচার্য।

কবির জীবনে তাই আকাঙ্ক্ষিত নতুন পৃথিবীর সভ্যতার আলোতে নতুন জীবনের আবির্ভাবকে সার্থক করে তুলতে আত্ম বিসর্জনেও কোন গ্লানি নেই। তাইতো কবি তাঁর বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে দ্বিধাহীন চিত্তে জানান :

"তবুতো জীবন দিয়ে এক নতুন কে সার্থক করে গেলাম, এই আমার আজকের জীবনের সান্ত্বনা।"

২৪শে পৌষ ১৩৪৮।

সুকান্ত তাঁর জীবনে যে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন জাতির জীবনে সে প্রেরণার একাগ্রতার অভাবও লক্ষ্য করেছেন। বোমার ভয়ে মুছড়ে পড়া আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের দল তখন প্রাণ ভয়ে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে শুরু করেছে। ভীরুতা এসে মনকে আশ্রয় করেছে। কবির চোখে জাতির জীবনে এই ভীরুতা ও কাপুরুষতা ধরা পড়েছে। তাইতো কবি তাঁর বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন :

"এখন আর ভীরুতা নয় দৃঢ়তা।"

২৮শে ডিসেম্বর : ১৯৪৮।

ভয়ে ভয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মধ্যে কবি জীবনের কোন সার্থকতা খোঁজে পান না। সৃষ্টির বিনাশই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মূল পরিণাম। তাইতো কবি তাঁর জীবন চেতনায় উপলব্ধি করেন :

"বোমারু বিমান সব সময়ই পৃথিবীর নশ্বরতা ঘোষনা করছে।"

২৮শে ডিসেম্বর : ১৯৪২

এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার মত মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একা
বিশেষ পরিবেশ ও জন জীবনে একটা বিশেষ চেতনার প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবা
শাসকগোষ্ঠী যুদ্ধকে ডেকে আনে কখনো দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নামে, আবা
কখনো বা তারা যুদ্ধ সম্পর্কে জাতিকে প্রলুব্ধ করে ধর্মবিস্তার বা ধর্ম রক্ষার ঘোষ
করে। দেশের স্বাধীনতার প্রতি গভীর অনুরাগ ও ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস
দেশের মানুষ অহেতুক জীবন-বিনাশী যুদ্ধকে বরণ করে নেয়। দেশের ে
সভ্যতা ও কৃষ্টি জীবনের মহামূল্যবোধে গড়ে ওঠে, যে সভ্যতা ও কৃষ্টি শেষ পর্য
মহাযুদ্ধের কবলে পড়ে ধ্বংস ও বিনাশকে ডেকে আনে, যে যুদ্ধে সাধারণ মানুষে
জীবন ও ধন-সম্পত্তি বিপন্ন সে যুদ্ধের আবির্ভাব ঠেকাতে সার্বজনীন প্রচেষ্টা থাক
প্রয়োজন। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই,—জীবন ধারণে মুক্তি চাই, সমাজ জীবনের এ
মানসিক দৃঢ়তাও প্রয়োজন। তাই জাতির জীবনে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঠেকাতে
কবি হয়ত জনযুদ্ধের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু কবি সমাজ জীবনে সাধার
মনে সেই চেতনার অভাবই বার বার লক্ষ্য করেছেন।

দেশ ও মাটিকে নিজের জীবনের মত দেখা, তাকে নিজের জীবনের মত
ভালবাসা সমাজে ক'জন মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তাই তো প্রায় দেড়শ' বছর
ধরে পরাধীনতা বরণ করে নেবার পরও সাধারণ মানুষ নিজের দেশ ও জাতির
এই পরাধীনতা সম্পর্কে উদাসীন, বাস্তব জীবন সচেতনার এবং স্বাধীনতার মর্ম
বোধের অভাবই এই উদাসীনতার মূল কারণ। দেশ ও জাতির প্রতি কবি
সুকান্তের গভীর অনুরাগ এবং নিষ্ঠাবোধ কবিকে একনিষ্ঠ দেশ প্রেমিকে পরিণত
করেছে। কবির চোখে তাঁর দেশ :

"আজন্ম দেখেছি আমি আশ্চর্য নতুন এক চোখে
আমার সোনার দেশ, আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।"

মনিপুর : ঘুমনেই।

যে দেশ ও তার মাটি কবির প্রাণ-মনকে অপূর্ব এক শিহরণে ভরিয়ে তোলে
কবির হৃদয়ে গোপনে দোলা দিয়ে যায়।

"আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের ছোঁয়া মাটি।"

মনিপুর : ঘুমনেই।

কবির দৃষ্টিতে তাঁর দেশ নিত্য নতুন রূপে ধরা পড়ে, কবি তাই অবাক বিস্ময়ে
তাঁর দেশ-আকাশ-মাটি-জল কে নিত্য নতুন অনুভূতিতে উপভোগ করার স্বপ্ন

দেখেন। হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষের বুকে কত বিদেশী শত্রুর আক্রমণ চলেছে,—শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারে জাতির জীবন দগ্ধ হয়েছে,—চলেছে দেশের বুকে শাসক শক্তির উত্থান-পতন। এই উত্থান পতনের সূত্র ধরে কত মানুষের রক্ত ঝরেছে এ মাটির বুকে। কিন্তু কবি আজ এই পরাধীন জাতির মর্ম-সুর যেন শুনতে পান:

"যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,"

মনিপুর: ঘুমনেই।

কিন্তু সে মুক্তির জন্য জাতির জীবনে যে শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন জাতির জীবনে সে শক্তি ও সাহসের মানসিক দৃঢ়তা কোথায়! মানুষ আজও দেহে ও মনে দুর্বল,— জাতির জীবনে সেই অসহায় ও দুর্বল রূপকে স্মরণ করেই শত্রুর দল দেশ ও জাতির জীবনে যুগে যুগে তার মারণ যন্ত্রের শক্তিশেল প্রয়োগ করেছে। পদদলিত করেছে মানবতাকে, অস্বীকার করেছে মনুষ্যত্বের দাবীকে। জাতির জীবনে যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ বর্তমান থাকলেও সেই বিক্ষোভকে সংগঠীত সংগঠিত করার নির্ভয় মানসিকতা জাতীয় চরিত্রে বড় একটা ছিল না। তাইতো জাতীয় চরিত্রের এই মনোভাবকে লক্ষ্য করে কবির কণ্ঠে ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে:

"আজকে যখন এই দিক প্রান্তে ওঠে রক্ত-ঝড়,
কোমল মাটিতে রাখে শত্রু তার পায়ের স্বাক্ষর,
তখন চিৎকার ক'রে রক্ত বলে ওঠে, ধিক্ ধিক্,
এখনো দিল না দেখা দেহে দেহে নির্ভর সৈনিক।"

মণিপুর: ঘুমনেই।

কবি জাতির জীবনে একাংশের চরিত্রে ইংরাজ সরকারের বশ্যতা ও দাসত্বকে মেনে চলার প্রবল প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। ব্যক্তি স্বার্থের অন্ধমোহে দেশও জাতির সার্বিক স্বার্থকে ধুলিসাৎ করে দিতেও তাদের বিবেক বিচলিত হয় না। অপর দিকে একাংশের মনে রয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনোভাব। তাই জাতির জীবন দেবতার কাছে কবির একান্ত প্রার্থনা:

"দাসত্বের ছদ্মবেশ দীর্ণ করে উন্মোচিত হোক
একবার বিশ্বরূপ হে উদ্দাম, হে অধিনায়ক।"

মনিপুর: ঘুমনেই।

ইতিহাস নীরব সাক্ষী। সে তো সত্যকে প্রকাশ করে তথ্যের সমর্থনে।

তাই ইতিহাসের বিচারে মুক্তি কারুর নেই। নেই অন্তর্ঘাতী শত্রু শ্রেণীর,—নেই সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর এবং তাদের বংশোদ্ভব পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর। সাধারণ শোষিত মানুষ শেষ পর্যন্ত তাদের শত্রুদের স্বরূপ চিনতে সমর্থ হয়। জীবনের প্রতি পেছুটান এবং সংগ্রাম বিমুখতাই মানুষকে আরও দুর্বল ও অসহায় করে তোলে। তাছাড়া বাস্তব জ্ঞান এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাব মানুষকে অনেক সময় কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে রাখে। তবু মানুষ পর পর দু'টি মহাযুদ্ধকে জীবনের অভিজ্ঞতায় তার স্বরূপ-সন্ধানে সক্ষম হয়েছেন। উপলব্ধি করেছেন সাম্রাজ্যবাদীর আগ্রাসী নীতিই এই যুদ্ধের কারণ,—অথচ এই যুদ্ধে কত জীবন ও যৌবন অকালে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। ধ্বংস হয় শিল্প, কৃষ্টি ও সভ্যতা। অসংখ্য জীবন নাশ ও প্রচুর রক্ত ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আজ মানুষ তার জীবনের সত্য মূল্যকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তাই জনজীবনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল থেকে মুক্তির স্বপ্ন আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পরাধীনতার শৃংখল মুক্তির মুক্তি-পিপাসা আজ মানুষের হৃদয়ে। অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বিচলিত—তারা ও আজ পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বে কোনঠাসা। নিজেদের ঘর সামলাতেই আজ তারা ব্যস্ত। তাই আজ জনতার মহাজাগরণের ভয়ে তারা চিন্তান্বিত। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ শাষক শ্রেণীর কাছ থেকে অন্যায় শোষণ ও অত্যাচার বহু সহ্য করেছে,—দিয়েছে অনেক রক্ত বৃথা কারণে। কিন্তু আজ তারা বিচারের প্রতীক্ষায়। তাই সাধারণ মানুষের অন্তরের সেই কঠীন প্রশ্ন কবি বুঝি শুনতে পান :

"অনেক নিয়েছো রক্ত দিয়েছো অনেক অত্যাচার
আজ হোক তোমার বিচার।"

দিন বদলের পালা : ঘুমনেই।

কবি যেন জনতার কণ্ঠে 'দিন বদলের পালা' গানের দৃপ্ত সুর ও কঠীন ঝংকার শুনতে পান। তাই কবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখতে পান জনজীবনে স্বাধীনতা লাভের মুক্ত জোয়ার,—বাংলার মাঠ-প্রান্তর, হাট ও ঘাটে মুক্তির মুখর জয়গান :

"উদ্দাম ধ্বনি মুখরিত পথ ঘাটে,
পার্কের মোড়ে, ঘরে, ময়দানে, মাঠে
মুক্তির দাবী করেছি তীব্রতর
সারা ক'লকাতা স্লোগানেই থরো থরো।"

মুক্ত বীরদের প্রতি : ঘুমনেই।

এই জন-জোয়ারের সামনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম নয় তখন তাদের মধ্যে চলে গুপ্ত মন্ত্রনা। জনতার মিলিত শক্তিতে ফাটল ধরানোর পরিকল্পনা। শাসক-গোষ্ঠী তার শেষ মারণ অস্ত্র গৃহযুদ্ধের বান ছুড়ে দেয় জাতির জীবনে। ধর্ম ও প্রাদেশিকতার বীজমন্ত্রে এই অন্তর্ঘাতী গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। প্রাক স্বাধীন এই ভারতের বুকে গৃহযুদ্ধের ঝড় বয়ে যায়,—শাসক গোষ্ঠী খুব সচেতন ভাবে' সুকৌশলে আন্দোলন মুখী সাধারণ জনতার মিলিত শক্তির ধ্বংস সাধনে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। আর সেই ফাঁকে শাসক গোষ্ঠী তার শক্তিকে আরো জোরদার করার চেষ্টা করে। শাসকগোষ্ঠী একান্তই নিরুপায় হয়ে সমস্যামুক্তির তাগিদে একদিকে যেমন সময় সময় গৃহযুদ্ধের ইন্ধন যোগান অপর দিকে সেই গৃহযুদ্ধ দমনের নামে দেশের যুব শক্তির বিনাশ করেন। আর দেশের যুব শক্তিই হল শাসক গোষ্ঠীর কাছে সব চেয়ে ভয়ের কারণ আর সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা ও অন্ধমোহে উত্তেজনাবশে সে ফাঁদে পা দেয়,—অথচ তারা বুঝে না যে, সেই ফাঁদেই তাদের জীবনে বিনাশের ষড়যন্ত্র এবং দেশের যুবশক্তির হৃদপিণ্ডে ক্ষয়রোগের বীজ বোনা হতে থাকে। কবি এ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের মাধ্যমে। তাই তো কবির আক্ষেপ ভরা কণ্ঠস্বর শুনি:

"………সেদিনের কলকাতা—
হেঁট হয়েছিলে অত্যাচারী ও দাম্ভিকের মাথা।
জানি বিকৃত আজকের কলকাতা
বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা!
গৃহ যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে—
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙ্গে চুরে খান খান।"

মুক্ত বাঁধের প্রতি : ঘুমনেই।

জনতার ধর্মান্ধ চোখে সত্যের নিশানা তাই বুঝি ধরা পড়ে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মূলতঃ সংগ্রাম, আর যেখানে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের মানুষ ধর্মমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ, জাতির সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠি অতি সুকৌশলে ফাটল ধরাতে সক্ষম হ'ল। আর সেই ফাটলের সূত্রবীজ ধরা দিল ধর্মীয় গোঁড়ামির পথ ধরে। জাতীয় জীবনে অনৈক্য দেখা দিল। পরস্পর হিংসা-প্রতিহিংসায় জনজীবন বিপর্যস্ত হ'ল। ইংরাজদের

হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার কল্পনায় জনমনে যে সংগ্রামের শপথ বানী ধ্বনিত হয়েছিল, পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সে সংগ্রামের কথা চাপা পড়ল। আর শেষ পর্যন্ত সেই ইংরাজ-ই এল পরস্পরের ভ্রাতৃঘাতি এই জিঘাংসা-বৃত্তি দমনের নাম করে জাতির জীবনে মূল ত্রাতারূপে। একথা ভুললে চলবে না যে, জাতির জীবনে এ বিপর্যয়ের মূলে দেশের প্রতি অন্তর্ঘাতী শক্তিগোষ্ঠীর হাতও কম নয়। কেননা বিদেশী শাসক গোষ্ঠী যে তাদের স্বার্থে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ও বিদেশী চরদের সাহায্যেই অন্তর্ঘাত মূলক নানা ষড়যন্ত্র একের পর এক করে চলে। সে সত্য সাধারণ জনতার দৃষ্টিপথে সহজে ধরা পড়ে না। কারণ তাদের ক্ষুদ্র বাস্তব অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষের জীবনের এই শত্রুদের শ্রেণী চরিত্র সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। তাই কবি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার মানসে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন :

> "এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
> বাইরে নয়, ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী,"

ছুরি : ঘুমনেই।

পুজিবাদীসমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনে ঘরে ও বাইরে শত্রু বর্তমান। শোষক শ্রেণী সেই গৃহশত্রুদের পোষেন তাদের বাড়তি ভোগের পাহাড়াদার-রূপে। গোপনে সাধারণ মানুষের কর্মে ও জীবনে অশান্তির বীজ ছড়ানোই হল তাদের পেশা। শাসক ও শোষক শ্রেণী যে ষড়যন্ত্র করে সে ষড়যন্ত্রকে কায়েম করার কাজে এরা পূর্ণ সহযোগিতা করে। তাই পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাধারাণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা এ ধরণের শ্রেণী শত্রুদের স্বরূপ সন্ধানে কবি দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ম। তাই কবির এই সতর্ক বাণী সাধারণ মানুষের জীবনে উপলব্ধির একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত হন। শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ শোষণের সঙ্গে ও তারা পূর্ণ পরিচিত নন। তাই শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিভ্রান্তিকর প্রচারে অনেক সময়েই তারা প্রতারিত হন। তাদের জীবনে দুঃখ-অশান্তি ও মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণা আছে কিন্তু মূল কারণে অনুসন্ধানে তারা সক্ষম নন। অদৃষ্টবাদ সাধারণ মানুষের জীবনের মর্মমূলে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু তবু প্রত্যক্ষ শোষণের সঙ্গে পরিচিত ভুক্তভোগী কিষাণ-শ্রমিক তাদের প্রধান শত্রু শাসক ও শোষক-শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে প্রায় সচেতন। তাইতো শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কিষাণ-শ্রমিক শ্রেণীই সব চেয়ে আগুয়া বাহিনীর দায়িত্ব

পালন করে। তাদের মিলিত শপথ বাণীই শাসক শ্রেণীর ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। কবির মুখে সেই আশার বাণী শোনা যায়:

"... ... ...শপথ মুখর কিষাণ-শ্রমিক পাড়া,
হাজারে হাজারে মাঠে বন্দরে আজকে দিয়েছে সাড়া।"

কবে: ঘুমনেই।

কিন্তু কবির জীবনে তবুও সংশয়। কবি যে সমাজ ও শ্রেণী সচেতন, দেখেছেন পরাধীন জাতির জীবনে নানা বৈষম্য। প্রত্যক্ষ করেছেন একাংশের মনে স্বার্থ চিন্তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—ব্যক্তিগত লোভ হিংসা জর্জর মনের দীনতা, ধর্মে ধর্মে বিরোধ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দাঙ্গা, অন্তর্ঘাত শক্তির প্রকোপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎস প্রতিক্রিয়া, শাসক ও শোষক শ্রেণীর ভাড়াটে দালাল ও পোষমানাদের দেশদ্রোহী চরিত্র তাছাড়া সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক ঐক্যের অভাব। সমাজ জীবনের মনন চেতনায় এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেশ ও জাতি কবে যে মুক্তির পথ পাবে সে কঠীন-প্রশ্নই কবির চিন্তায় ধরা পড়ে। জাতির জীবনে এ সমস্ত প্রতিকূল অস্তিত্বের সম্ভাবনা গুলি বর্তমান থাকায় কবির মনে তাই প্রশ্ন জাগে:

"সার, পৃথিবীর দুয়ারে মুক্তি, এখানে অন্ধকার,
এখানে কখন আসন্ন হবে বৈতরণীর পার?"

কবে: ঘুমনেই

কবি আশাবাদী। কবি জানেন, এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও আক্রমন; এবং পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর শোষন পীড়ন অত্যাচার একদিক স্তব্ধ হয়ে যাবে। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শাসক গোষ্ঠীর পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্বে পৃথিবীর প্রাচীন কৃষ্টি ওসভ্যতা ধ্বংস হবে। কবি জানেন এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস পৃথিবীর সেই পুরাতন সভ্যতার ধ্বংস স্তুপেই এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও কৃষ্টি জন্মনেবে, মুক্তি পাবে পৃথিবীর শোষিত সমাজ, মুক্তির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবে নতুন জীবন। কবি তাও জানেন, নতুন সমাজ নতুন জীবনের আবির্ভাব ঘটা কোন এক আকস্মিক ঘটনা নয়—তার জন্যে চাই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম—স্বৈরাচারী শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কবি ইতি মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর মুক্তিকামী দেশগুলির মুক্তির সংগ্রাম ও তার রূপরেখা। তাই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কবির চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি। তাই তো বিপ্লব সমাধানর ক্ষেত্রে সমাজের সর্বশ্রেণীর মনে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটা প্রয়োজন।

সর্বোপরি বিপ্লব সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাই তো কবি সুকান্তের কণ্ঠে শুনি এক নতুন আ হ্বান :

> "এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
> বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর
> জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
> চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।"
>
> পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে : ঘুমনেই।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী সমাজ অনেক সময় তাঁর দায়িত্ব পালন করে না। তা অনেকটা নিজের জীবনের ভয়ে ও স্বার্থের তাগিদে। প্রাক্ স্বাধীন ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একাংশের মনে এই নিষ্ক্রিয়তা কবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাই কবি এক সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন, সমাজে আজ ক'জন কবি যথার্থ জনগণের কবি রূপে জীবন সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।'

যুগে যুগে শ্রমিকের রক্তেই গড়ে ওঠে সভ্যতার ইতিহাস। অথচ শ্রমজীবী মানুষের জীবন দুর্বিসহ, মুমূর্ষু যন্ত্রণা কাতর। তাদের জীবন-প্রদীপ চির তিমির বরণে আচ্ছন্ন। তাই তো কবির মুমূর্ষু কাতর জীবনের গভীর আবেদন

> "রক্তে আনো লাল,
> রাত্রির গভীর বৃন্ত ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।" বিবৃতি : ছাড়পত্র।

বৃথা কারণে কবির এ আবেদন নয়। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কোন মূল্যই ঘোষিত নয়,—শ্রমজীবী মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখার স্বপ্নই দেখে শাসক গোষ্ঠী। কিন্তু এই শ্রমজীবী মানুষের মিলিত শক্তি শাসকের শক্তির তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন নয়। তারা চিরকাল রক্ত দিয়ে যায় তাই তাদের মনে সাহসেরও অভাব নেই। কিন্তু তাদের দৃষ্টি অনেকক্ষেত্রেই স্বচ্ছ নয় এমন কি উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তাজাল আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই যখন বুঝতে পারে, তিলে তিলে রক্তক্ষয়ের মধ্যদিয়ে তাদের দাসত্বকেই আরও পাকা করে তুলেছে তখন তারা মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠাবোধ করে না কারণ তারা উপলব্ধি করে অনাগত শিশুর মুক্ত বাসস্থান গড়ে তোলার জন্য এক স্বাধীন মুক্তপৃথিবীর প্রয়োজন। শ্রমজীবী মানুষের এই জীবনচেতনা বোধই মুক্তির নিশানা দেখায়। তাই তো শ্রমিকশ্রেণী সর্বদেশে শেষ পর্যন্ত শোষণের বিরুদ্ধে জীবন পণ জেহাদ ঘোষণা করে। তাই তো কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে

"হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক,
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার দিলো খুলে,
আজকে রক্তাক্ত পথ; উদ্ভাসিত দিক।"

রোম ১৯৪৩ : ঘুমনেই।

তাই তো শিল্পী ও শ্রমিকের বহু পরিশ্রমের গড়া প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নস্তূপ আসন্ন মুক্তির প্রচার ধ্বনিত হতে থাকে। মুক্তি ফৌজের রুদ্র রোষের সম্মুখে শত্রু পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র ও হার মানে। শেষ সংগ্রামের জয়ের আশাই তাদের জীবনে প্রেরণা যোগায়, মনে ও প্রাণে অসীম শক্তি ও দৃঢ়তা গড়ে তোলে। সময় সময় মুক্তিসংগ্রামী জনতার মনে দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেয় সত্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দ্বিধা ও সংশয় মনের দীপ্ত আশার আলোয় দূর হয়ে যায়। ভুলে যায় শোষক শ্রেণীর প্রচণ্ড মারণমুখী আক্রমণকে। উপেক্ষ করে চলে শাসন শ্রেণীর কামান গোলা ইত্যাদি আগ্নেয় অস্ত্রকে। কবির মুক্তির বাণী যেন তার জাতির জীবনে আশার বাণী ছড়ায় :

"মুক্তি সশস্ত্র ফৌজ আসে অগণিত
দু' হাতে সংহার স্বপ্ন, বুকে তীব্র ঘৃণা
শত্রুকে বিধবস্ত করা যেতে পারে কিনা
রাইফেলের মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা
যদিও উদ্বেগ মনে তবু দীপ্ত আশা
পথে পথে জনতার রক্তাক্ত উত্থান,
বিস্ফোরণে ডেকে ওঠে বান।
ভেঙ্গে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ
বিক্ষোব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।

রোম ১৯৪৩ : ঘুমনেই।

শোষনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রশ্নে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সক্রিয় সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। সাধারণ শোষিত জনতার সংগ্রামী চেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফসল হল মুক্তি সংগ্রাম। আর মুক্তিসংগ্রামের মুক্তিফৌজ সাধারণ শোষিত মানুষের মিলিত শক্তির প্রতিনিধিরূপ জীবন সংগ্রামের রণক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে হাতিয়ার তুলে ধরে—আপন বাহুবলের শক্তিতে শত্রুর হাতের হাতিয়ার কেড়ে নেয়। তাই শোষিত মানুষের জীবন মুক্তির সংগ্রাম

সে কেবল নিছক খেলার বস্তু নয় তা হল সাধারণ শোষিত জনতার জীবন-মরণ সমস্যা জীবন মুক্তির মহাপূজা। তার জন্য চাই সমাজে শোষিত শ্রেণীর সার্বজনীন প্রচেষ্টা। কেননা মুক্তির সংগ্রাম সে তো জাতির জীবনে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনায় সম্পন্ন হতে পারে না—তার জন্য চাই নিবিড় পরিকল্পনা ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মানসিকতা। তার জাতীয় জীবনে—

"তার জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।"

ঐতিহাসিক : ছাড়পত্র।

কবি তাঁর জাতির জীবনে বিশেষতঃ শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও অনৈক্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থা গুলি লক্ষ্য করেছেন। তিনি জীবন অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন, সমাজে এই শোষিত শ্রেণীর মিলিত শক্তির অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ভিন্ন জাতির জীবনে মুক্তি সম্ভব নয়।

আজও যদি সাধারণ শোষিত শ্রেণী-মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রশ্নে পরস্পর ঐক্যসূত্রে মিলিত হতে না পারে তবে জাতির জীবনে শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিনামরূপে সময়ে সময়ে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর অহেতুক আবির্ভাবে প্রাণের বলি বন্ধ হতে পারে না এবং জীবন নাশের নানা ষড়যন্ত্রের অবসান ও সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেননা নিষ্ঠুর পেষণে—

"বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু' পাশে,
প্রত্যক্ষ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

বিবৃতি : ছাড়পত্র।

সাধারণ মানুষের ঘরে ভাড়ারে আজ খাদ্য নেই। শোষণের আগ্রাসী-নীতির কবলে নিরন্ন মানুষ জীবন-যন্ত্রণা ও বুভুক্ষার জ্বালায় আর দৈন্যের হাহাকারে মৃত্যুর দিন গোনে। ক্ষুধার জ্বালায় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট পচা গলা খাবারের আশায় মানুষের ও আজ ভীড় জমে ওঠে। সাধারণ নিরন্ন মানুষ তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জ্বালা মেটাতে আজ আস্তা কুঁড়ের উচ্ছিষ্ট খাবারের শরিকদেরও সামিল হতে হয়। সমাজের বুকে জীবনের এই ভয়ঙ্কর শোচনীয় পরিণাম আর একশ্রেণীর মানুষের হাতে গড়া সাধারণ মানুষের জীবনে শোষণের মৃত্যু ফাঁদে কবির প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার অসহনীয় যন্ত্রণা দেখা যায়। অদৃষ্টের দোহাই আর ভগবানের বিধান বলে এক শ্রেণীর মানব যুগে যুগে শোষণের বনিয়াদকে দৃঢ় করে তুলেছে; আর মুমূর্ষু নির্বাক সাধারণ মানুষ যুগে যুগে তাদের শক্তিকে সেই বুর্জোয়া প্রচারের মুখে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। আর জীবনের

অনিশ্চিত সম্ভাবনা এবং বর্তমান জীবন যন্ত্রণাকে অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জেনে নীরবে সমস্ত সহ্য করেছে। তাতে আজও জীবনের মুক্তি ঘটেনি, পায়নি জীবনে সত্যের সন্ধান, অপর দিকে অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে শোষক শ্রেণী যুগে যুগে সাধারণ মানুষের জীবনে যে বঞ্চনার পাহাড় গড়ে তোলে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলে :

"তারপর একসময় আস্তাকুঁড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু তিনটি মানুষ।"

একটি মোরগের কাহিনী : ছাড়পত্র

এ যে সমাজের জোতদার, মজুতদার ও মুনাফাখোর মালিক শ্রেণীর নিষ্ঠুর শোষনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কবি সুকান্তের জীবন দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়ে। আর তারই একান্ত পরিণতির ফলে কবি দেখতে পান যুগের ইতিহাসে পুঁজি বাদী সমাজ ব্যবস্থায় নিয়তই :

"দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল।"

বিবৃতি : ছাড়পত্র।

সেই গ্রামীন জীবন যন্ত্রণায় অসহনীয় বোঝা বেড়ে ওঠে—ঘরে ঘরে নিরন্ন মানুষের মর্মন্তুদ হাহাকার ওঠে—ক্ষুধিত মানুষ তার দীর্ঘ উপবাসের জ্বালা মেটাতে এক মুঠো খাবারের আশায় শহরের বুকে এসে হাজির হয়। ফলে গ্রামগুলি একে একে ফাঁকা হতে শুরু করে—শহরাঞ্চলের জীবন যাত্রায়ও কবি এই চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। তাই তো কবির বিবৃতিতে ধরা পড়ে সমাজের বাস্তবরূপ :

"জমে ভিড় ভ্রষ্ট নীড় নগরেও গ্রামে,"

বিবৃতি : ছাড়পত্র।

কবির জীবনচেতনায় সমাজের বুকে এই নগ্নরূপ ও তার শোচনীয় পরিণাম মর্মান্তিক মনন পীড়নের কারণ হয়ে ওঠে। যে মানব সভ্যতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে জানে না, যে সভ্যতায় সমাজের এক শ্রেণী মানুষের ভোগের প্রাচুর্য বাড়ানোর তাগিদে, সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনে দুঃখ-অনাহার, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগের নিত্য পীড়ন চলে,—ক্ষুধার জ্বালায় ও বাঁচার তাগিদে সমাজ-জীবনে নিত্য হাহাকার ওঠে মায়ের কাছে তার সন্তান অসহনীয় হয়ে ওঠে, এমনকি রক্তের সম্পর্ক অস্বীকারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না কবির জীবনের কাছে সে সমাজ ও সভ্যতার কোন মূল্য নেই। কবি তাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন :

"ধ্বংস হোক, লুপ্ত থেকে ক্ষুধিত পৃথিবী
আর শিথিল সভ্যতা।......"

তারুণ্য : পূর্বাভাস।

কিন্তু সৃষ্টির বিনাশ হোক কবি তা চান না। কবির কাছে সৃষ্টির মূল্য অপরিসীম। তাই সৃষ্টিকে রক্ষার তাগিদ কবির জীবনে প্রবল। অথচ সে সৃষ্টিকেই ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ। যাদের কাছে সৃষ্টিকে সুন্দর করে রক্ষার চেয়েও সৃষ্টির বিনাশ সাধনেই তৃপ্তি, সমাজে শোষণ ও পীড়ন হয় শ স্থির, যারা সুন্দরকে বিকৃত করে আনন্দ পায়, অন্যায়কে ন্যায় বলে সাধরণ মানুষের জীবনের ওপর চাপিয়ে দেয়, বে-আইনীকে আইনী বলে জাহির করে, কৃষ্টির নামে অপকৃষ্টির আরাধনা করে এবং যে অপকৃষ্টির আমদানির ফলে সমাজে যুবশক্তি বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়,—সেই মুষ্টি মেয়ের স্বার্থে তথাকথিত মনগড়া সভ্যতার ধ্বংস ভিন্ন নতুন সভ্যতার জন্ম হতে পারে না। এই প্রচলিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্ক যত দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব অথবা মোহই থাকুক না কেন সমাজে সুন্দর ও সুস্থ জীবন বোধ গড়ে তুলতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সমাজের বুকে অন্যায়—পীড়ন অত্যাচার ও শোষনের দ্বারপ্রান্ত-গুলির ওপর প্রবল আঘাত হানতে হবে,—মুক্ত করতে হবে মনুষ্যত্বের বেদীকে। তার জন্য সমাজের বুকে প্রধান শত্রুদের সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হতে হবে তাই তো কবি দ্বিধা দোদল্যমান জাতির উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছেন :

"আজকে ভাঙার স্বপ্ন অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
... ...
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে।

অনন্যোপায় : ছাড়পত্র।

জীবনে এই মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রয়োজন সুকান্ত শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের সন্ধিক্ষণেই সে সাহসিকতা ও দৃঢ়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সত্যকে যেমন স্পষ্ট করে চিনেছিলেন তেমনি সে সত্যকে স্পষ্ট করে বলেছেন। অনেকে হয়ত সুকান্তের কাব্যে আক্রমণের ভাষা অথবা পার্টি'র শ্লোগানধর্মী পদ-বিন্যাস খুঁজে বেড়ান,—তাদের সম্পর্কে একটি কথাই

বলা চলে যে, তাঁরা সুকান্তকে যথার্থ উপলব্ধি করতে প্রয়োজনীয় ধৈর্য ও উপযুক্ত যত্ন নিতে প্রস্তুত নন। সুকান্ত কতবড় কবি সে আলোচনায় গভীরে না গিয়ে আমরা যদি তাঁর কাব্যের মূল সুর ও তার অন্তর আবেদনের যথার্থ মূল্যায়ন-নির্ণয়ে ব্রতী হই, তবে তাঁর কাব্যের যথার্থ পরিচিতি ও মূল্যয়ন সম্ভব, সুকান্ত কবি, সুকান্ত কর্মী, সুকান্ত প্রেমিক;—যে প্রেম জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে নিবিড় প্রেরণা যোগায়, সত্যকে নিয়ত মুক্তির আলিঙ্গনে স্বাগত জানায়। সুকান্ত ইতিহাসের সাক্ষী, তিনি বর্তমানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন আর ভবিষ্যত-মুক্তির অনুসন্ধান করেছেন জীবন কর্মা-সাধনায়। তাই সমাজের বুকে যে সমস্ত অসংগতি, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বর্তমান, সুকান্তের প্রতিবাদ কণ্ঠ সেখানেই সোচ্চার। ভাবের রাজ্যে আত্ম-বিচরণের নিছক কল্পনা ও আত্ম-তৃপ্তির নিছক ছলনা কবির জীবন ভাবনা নয়। পৃথিবীর এই বাস্তব-অস্থিরতার মুহূর্তে, জীবনের শান্তি ও মনের ক্ষুধা-তৃপ্তি যে সম্ভব নয়, সেখানে জীবন যে আত্ম-নিমগ্ন হয়ে নির্দিষ্ট কোন বাধা-পথে কিংবা ভাবের আবর্তে বিচরণ করতে অক্ষম, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে সেই অস্থির-তার যুগে কবি সে সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির সে মর্মবাণীই সত্য স্বাক্ষরে উজ্জল হয়ে ওঠে :

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি !

হে মহাজীবন : ছাড়পত্র।

উপসংহারে আমরা স্মরণ করি কবির বাস্তব জীবন দৃষ্টির উজ্জল স্বাক্ষর-লিপি। সুকান্তের কাব্য চিন্তায় সমাজচেতনা যেভাবে আশ্রয় পেয়েছে তাতে সুকান্ত কেবল কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত নন তিনি একজন সমাজ সচেতন জীবন শিল্পীরূপেই সাধারণের জীবনে স্বীকৃত। কবি ও কর্মী সুকান্তের পরিচয় তাঁর কাব্য ও জীবন-ধর্মে পরি-ব্যাপ্ত। সুকান্তের সমাজচিন্তা তাই তাঁর কাব্যের প্রতি পংক্তিতেই মুক্তি পেয়েছে।

॥ কথা শেষ ॥